NAEEM

Pathfinder

কবি ও কোলাহল

আল মাহমুদ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Scanned by
Pathfinder

Edited by
NAEEM

Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কবি ও কোলাহল

আল মাহমুদ

Scanned by: Kamrul Ahsan (Pathfinder)
Edited by: Aiub Talukder (Naeem)

Website
www.Banglapdf.net

Facbook Page
www.facebook.com/Banglapdf.net

Facebook group
www.facebook.com/groups/we.are.bookworms

কবি ও কোলাহল : আল মাহমুদ প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৩ মাঘ ১৩৯৯ প্রকাশক শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫ পোষ্ট বক্স নং ৫১১৮ টেলিফোন ৫০৮৩৫২ ৮৬৪২৬৪ মুদ্রণ শিল্পতরু প্রিন্টার্স এ্যান্ড এ্যাডভার্টাইজার্স ২৯১ সোনারগাঁও রোড ঢাকা ১২০৫ স্বত্ব সৈয়দা নাদিরা মাহমুদ প্রচ্ছদ শিবনাথ বিশ্বাস অলঙ্করণ হামিদুল কবীর কম্পোজ দেলোয়ারা শাহজাহান ইসলাম মূল্য পঞ্চাশ টাকা মাত্র

শিল্প : ১৫১ : ১৯৯৩

ISBN 984- 455-000-2

Kabi O Kolahal a Novel by Al Mahmud Published by Shilpatoroo Prakashani 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 Post Box No 5118 Telephone 508352 864264 Printed by Shilpatoroo Printers & Advertisers 291 Sonargaon Road Dhaka 1205 (c) Syeda Nadira Mahmud Cover Design Shibnath Biswas Compose Delowara Shahjahan Illustration Hamidul Islam Price $ 10

এবনে গোলাম সামাদ

বন্ধুবরেষু

শিল্পতরু প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
আল মাহমুদের অন্যান্য বই

একচক্ষু হরিণ

দিনযাপন

কবির আত্মবিশ্বাস

আল মাহমুদের গল্প

ডানকী

অপারেশন থিয়েটার থেকে মাশুককে কেবিনে নিয়ে আসা পর্যন্ত মেয়েটি সর্বক্ষণ দরজার বাইরে অপেক্ষা করেছে। এখনও অপেক্ষা, কখন ডাক্তার বা নার্সদের কেউ কেবিনের বাইরে আসবে। এখন পর্যন্ত কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি কে সে? আহত ভদ্রলোকের সাথে তার সম্পর্কটা কি? কিংবা ছিনতাইকারীর ছুরির আঘাতের পর কিভাবে তিনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারলেন? কেবল ভদ্রলোকের ক্ষতে হাত চেপে ধরে সে এসে ইমার্জেন্সীতে পৌঁছামাত্র কর্তব্যরত এক ডাক্তার যুবক আহতকে দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠল, 'আরে আপনার আবার কি হল? আপনি কবি মাশুকুর রহমান না?'

'ঠিকই ধরেছেন, আপনাকেও চেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনি আদিল ভাই। কুমিল্লা জেলা স্কুলে পড়তেন। আমার রক্তটা আগে বন্ধ করুন পরে সব শুনবেন। ছিনতাইকারীদের কাণ্ড।'

মাশুককে একটা টেবিলে শুইয়ে দেয়ার আগে মেয়েটি তার হাত সরাবার মাত্র আবার ফিনকি দিয়ে মাশুকের-ক্ষ দিকের কণ্ঠার হাড়ের একটু ওপরের ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে দেখে ডাঃ আদিল চমকে গিয়ে পাশের নার্সকে বলল, 'সর্বনাশ। এত দেখি সিরিয়াস ওণ্ড! আগে রক্তপড়া বন্ধ করে একটা ইনজেকশান পুশ্ করুন। আমি দেখছি এখুনি অপারেশন চেম্বারে নেয়া যায় কি না।'

বলেই ডাঃ আদিল বেরিয়ে গেলে নার্স যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার মধ্যেই মাশুক জ্ঞান হারাল। এর পর একটা হুলুস্থুল কাণ্ড। ডাঃ আদিল দু'জন ডাক্তার এবং আরো দু'জন নার্সসহ স্ট্রেচার নিয়ে দ্রুত মাশুককে উঠিয়ে নিল। একবার মাত্র মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'আসুন ভাবী, ঘাবড়াবেন না। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্ষতটা একটু পরীক্ষা করার জন্য অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছি। আনার সময় ক্ষতস্থান বেঁধে আনা উচিত ছিল। রক্ত একটু বেশী গেছে। আর টেনশনে কবি মানুষ তো জ্ঞান হারিয়েছেন। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসুন অপারেশন থিয়েটারের বাইরে একটু অপেক্ষা করবেন।'

মেয়েটি কোনো জবাব না দিয়ে ডাক্তার আদিল ও আহতের স্ট্রেচারের পেছন

পেছন অপারেশন থিয়েটারের বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকল।

আধঘন্টা পরেই ডাক্তার আদিল বেরিয়ে এসে বললেন, 'এই যে ভাবী, সব ঠিক হয়ে গেছে। রক্তটক্ত লাগবে না। ভেবেছিলাম খুব রক্ত পড়েছে। না তেমন কিছু নয়। ছুরিটাও তেমন দেবে যায়নি। চামড়ার নীচে একটু ঢুকেছিল মাত্র। নয় নম্বর কেবিনে শুয়ে দিচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে। একটু পরেই থানায় নিয়ে যেতে পারবেন। ঘটনাটা তো রমনা এলাকায় ঘটেছে?'

'জি।'

'প্রায় প্রত্যেক দিনই এসব হচ্ছে। সন্ধ্যের পরই কেস আসতে শুরু করে। আপনারা আবার এসবের মধ্যে পড়লেন কি করে? আপনার গায়ে তো কোনো গয়নাগাটি দেখছি না। আর মাশুক তো কবি মানুষ।'

মেয়েটি মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো জবাব দিল না। বলতে পারল না আহতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে মগবাজারের এক গলি বেয়ে পায়ে হেঁটে আসছিল। হঠাৎ রক্তে ভেজা পোশাক আশাক নিয়ে এই ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে একটু ধরে বড় রাস্তায় একটা রিকশায় তুলে দিন। আপনার একটু সাহায্য চাইছি। কোনো মারামারির ঘটনা নয়। আপনার মত এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ঐ পেছনের অন্ধকার মতো জায়গাটায় এলে কে যেন পেছন থেকে শালা বলে ছুরি মেরে পালিয়েছে। বুঝতে পারছি না কেন? ভয় পাবেন না, রিকশা পর্যন্ত যেতে পারলে আমি হাসপাতালে একাই চলে যেতে পারব।'

মেয়েটি প্রথম দর্শনেই চিৎকার দিয়ে কারো সাহায্য চাইবে ভেবেছিল। কিন্তু আহত লোকটার কথায় কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিক সাহস ও সততা আছে বুঝতে পেরে বলল, 'আমার হাতটা ধরে এগোন।'

মাশুক হাতটা ধরল।

'আপনি তো কাঁপছেন?'

'হ্যাঁ মাথাটা একটু দুলছে। হঠাৎ আঘাত পাওয়ায় ধকল।'

'কোথায় থাকেন?'

'ইস্কাটন।'

'আগে বাসায় যান। সেখান থেকে পরে না হয় হাসপাতাল যাবেন?'

'বাসায় কেউ থাকেন না। আমি একা মানুষ।'

'আপনার এমন শত্রু আছে আপনাকে অন্ধকার পথের গলিতে খুন করতে পারে জেনে একা বেরুন কেন?'

'কি করে জানবো এমন শত্রুও আছে? আমি তো কারো জমিতে হাল দিইনি।'

ততোক্ষণে তাদের পেছন থেকে একটা রিকশার আওয়াজ পেয়ে মেয়েটি মাশুকসহ দাঁড়িয়ে গেল। এ জায়গাটাও খানিকটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা থাকায় এদের সুবিধেই হল। একটা ছুরি খাওয়া মানুষসহ যে এখানে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন বুঝতে পারলে রিকশাওলা দাঁড়াবে না।

'এই রিকশা মেডিকেল কলেজ যাবে?'

বলল মেয়েটি।

'দশ টাকা বিবি সাব।'

জবাব পেয়েই দু'জন তাড়াতাড়ি চড়ে বসল।

মেয়েটিকে তার সাথে রিকশায় উঠে বসতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে তাকে কি যেন বলতে চাইল মাশুক।

'চলুন ইমার্জেন্সী পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছি। আমি ঐ সিদ্ধেশ্বরী কলেজে পড়াই। এ গলিতে বোনের বাসায় থাকি। আমার নাম দিশা। অসুবিধে নেই, আমি একা ফিরতে পারব।'

খুব নীচু স্বরে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটি। রিকশা এসে অয়ারলেস রেল গেইট পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠেছে। এখন সেক্সুরী মার্কেটের ফাঁক দিয়ে ঘুরে এসে বাঁ দিকের গলি দিয়ে মেডিকেল কলেজের পথটা ধরতে হবে। রিকশা বড় রাস্তায় ওঠা মাত্র পথচারীরা কেউ কেউ সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে রিকশাযাত্রী দু'জনকে দেখতে লাগল। মাশুকের সার্টের বাঁ দিকের কাঁধের অংশটা রক্তাপ্লুত। ইতিমধ্যে দিশা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে নিয়ে মাশুকের ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে চেপে রেখেছে।

হঠাৎ কেবিনের দুয়ার ঠেলে একজন সিসটার বেরিয়ে এসে দিশাকে বলল, 'যান, আপনার স্বামীর জ্ঞান ফিরেছে।'

দিশা ভেতরে গিয়ে দেখল মাশুককে ডাঃ আদিল পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বসানোর চেষ্টা করছে।

'এই যে ভাবী আসুন। সেল এসেছে। তবে কবিকে যে অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য এখানে রেখে যেতে হয়। কবির নার্ভ তো খুব দুর্বল। অসুবিধে হবে না আমি দেখব। আপনি কিছুক্ষণ থেকে বাসায় চলে যান। আমি নার্সদের বলে দিচ্ছি এরা রাতে ভালো করে কেয়ার নেবে। থানায় ফোন করে আমি নিজেই কেসটা ডায়রী করাব। সকালে এসে খোঁজ নেবেন। দরকার হলে ওষুধপত্র কিনে দিয়ে যাবেন। আমি তাহলে আসি।'

দিশাকে কোনো মন্তব্য করতে না দিয়েই কথাগুলো বলে ডাক্তার ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

দিশা এসে বেডের সামনে দাঁড়াতেই মাশুক বলল, 'দেখুন তো আপনাকে কি ফ্যাসাদে ফেললাম? যাবার আগে রক্ত শুকিয়ে থাকা হাত আর রুমালটা অন্তত টয়লেট থেকে ধুয়ে যান। বাসায় গেলে কেউ দেখলে কি ভাববে? চেনাজানা নাই অথচ আপনার সাহায্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

'এখনো যখন সেরে উঠতে আটচল্লিশ ঘন্টা লাগছে, তখন আর অত তাড়াতাড়ি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কেন? বরং নিকট আত্মীয়ের ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বার থাকলে দিন সুখবরটা পৌঁছুনোর যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

জবাব দিল দিশা।

মাথা নুইয়ে একটু হাসল মাশুক, 'আসলে এ শহরে আমার নিকটআত্মীয় কেউ নেই। দেশের বাড়ীতেও কেউ নেই। ছুরির ঘায়ে মরে গেলেও আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ছাড়া কেউ এগিয়ে আসবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ করি।'

'তাই নাকি? কবিতা পড়ে কিন্তু তা মনে হয় না। কবিতাতে তো দেখি আকাশের মেঘ থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক পরীদের আপন বানিয়ে রেখেছেন।'

'কবিতার মতো অপাঠ্য বিষয়ও পড়েন নাকি?'

'ইচ্ছে করে কি আর ওপথ কেউ মাড়ায়? অনেক দুষ্পাঠ্য বিষয়ের জটও কলেজের ছাত্রীদের সামনে খুলতে হয় বৈকি! সাহিত্যের অধ্যাপনা যখন করি তখন আপনাদের মত স্বপ্নের জগতের মানুষদের সাথে পরিচয় না ঘটলেও দু'চারখানা বই তো পড়ি! পড়ি অবশ্য পেটের দায়ে। মাস্টারি করে খাওয়া তো বোঝেন!'

হাসল দিশা।

মাশুক বলল, 'আমাদের পরিচয়টা তো দেখি বেশ একটু নাটকীয় মনে হচ্ছে!'

'ঢাকা শহর এখন নাটকেরই শহর। তবে আপনার সাথে সাক্ষাৎটা কিন্তু কাকতালীয়। যেভাবে সাহায্য চেয়ে অন্ধকারে এসে সামনে দাঁড়ালেন, আরেকটু হলে আমি নিজেও চীৎকার করে মূর্ছা যেতাম। তখন আবার অন্য মামলায় পড়তেন। আমাকেও জড়াতেন। আচ্ছা এখন আসি, কাল ছোট বোনটাকে নিয়ে এসে বিকেলে এক নজর দেখে যাব।'

দিশা মাশুককে কিছু বলা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নেয়ার আগেই পর্দা ঠেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে দিশা ভাবল, ইমার্জেন্সীতে গিয়ে ডাঃ আদিলের সাথে একটু কথা বলে যাওয়া উচিত। ভদ্রলোক সমানে 'ভাবী ভাবী' বলে খাতির করছিলেন। যেন সত্যি দিশা কারোর বউ। মজার ব্যাপার হলো যেখানে অধ্যাপিকা সৈয়দা দিশারী মালিকের নাকে মুহূর্তের জন্য একটা মাছিও বসতে পারেনা, সেখানে কিনা সম্বোধনটা শুনতে দিশার এতটুকুও অস্বস্তি লাগছিল না। ভালই লাগছিল, এটা অবশ্য দিশা মনে করে না। খারাপ বা অস্বস্তিকর যে লাগেনি এটাই দিশাকে এখন দারুণ অবাক করল। নাকি তার মনের গোপন কন্দরে একটু কৌতূহল মিশ্রিত পুলক জেগেছিল? নীচে নামার সিঁড়িতে উঠে এসব কথা ভেবে ভেবে হঠাৎ দিশা একটু শব্দ করেই বুঝি হেসে ফেলল। তার সাথে একজন বয়স্কা নার্সও নীচে নামতে গিয়ে ভদ্র মহিলাকে অর্থহীনভাবে একাকী হেসে উঠতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ভাবটা এমন যেন হাসপাতালে মানুষ হাসে না। দিশা ভদ্র মহিলার অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের অযৌক্তিক হাসির জন্য দুঃখ প্রকাশ করল।

'কিছু মনে করবেন না, এই এমনি।'

'আরে তাতে কি, এখানে ত কাউকে কোনেদিন অযথা হাসতে দেখি না, আপনার কোনো রোগীর বোধহয় ফাড়া কেটে গেছে। হাসুন না!'

নার্সের কথা শুনে দিশা আবার হাসল। এবার অবশ্য নিঃশব্দে।

'আপনি ঠিক ধরেছেন। আসি তাহলে, আমি একটু ইমার্জেন্সীতে ডাঃ আদিলের কাছে যাব।'

'তাহলে বাঁদিকে যান। ডাক্তার সম্ভবত এখন অফিসে। ওই সামনের কামরায়।'

আঙুলের ইশারায় নার্স ডাঃ আদিলের অফিস কামরাটি দেখিয়ে দিয়ে নিজেই এবার হাসতে হাসতে ডানদিকের ওয়ার্ডগুলোর দিকে চলে গেল।

দিশা ডাক্তারের কামরায় ঢুকে দেখল আদিল টেলিফোনে রমনা থানার সাথে কথা বলছে। হঠাৎ দিশাকে তার কামরায় ঢুকতে দেখে রিসিভারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এইতো মিসেস মাশুক ঢুকলেন। শোন্ নবী তুই বরং তার সাথেই কথা বল। তোদের পুলিশী খুঁটিনাটি সব জেনে নে। মাশুক তো ছাত্র জীবনে

তোরও পরিচিত ছিল। এমন ভালোমানুষও ছিনতাইয়ের শিকার হয়? অথচ দেখ, ভাবীর পরণে কোনো সোনাদানা নেই। নে কথা বল।'

রিসিভারটা দিশার দিকে এগিয়ে দিল ডাক্তার আদিল, 'নিন নবীর সাথে কথা বলুন। নবীও আপনার সাহেবকে চেনে। আমরা সবাই এক সময় কুমিল্লা জেলা স্কুলে পড়তাম। নবী এখন রমনা থানার চার্জে আছে, ধরুন।'

দিশা ত্যাবাচ্যাকা খেয়ে রিসিভারটা হাতে নিয়ে বলল, 'হ্যালো। না আমি কবি সাহেবের স্ত্রী নই। ডাক্তার একটু ভুল করে ফেলেছেন। মাশুক সাহেবকে এখানে নিয়ে আসা অবধি ভাবী ভাবী বলে আমাকে ডেকে যাচ্ছেন। একটু সুযোগ পেলেই আমি তাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতাম। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। এখন আপনাকে পুরো ব্যাপারটা আমি বলছি, আপনি লিখে নিন। জী না, আমি কবি মাশুকুর রহমানের কেউ নই। মগবাজার এলাকার একটা গলিতে আমি থাকি। আমার নাম সৈয়দা দিশারী মালিক। পিতা মরহুম সৈয়দ কাওসার মালিক, নিবাস রংপুর। পেশা শিক্ষকতা। আমি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের বাংলার টিচার, জি। ঘটনাটি হলো সন্ধ্যায় সেঞ্চুরীতে সামান্য কেনাকাটা সেরে ঘরে ফিরছিলাম। গলির মাঝামাঝি পৌঁছুতেই কবি মাশুকুর রহমান ছুরিকাহত অবস্থায় আমার সামনে এসে দাঁড়ান। আবছা আলোয় রক্তে ভেজা শার্ট পরা একজন মানুষ দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই যাই। কিন্তু আহত ব্যক্তি অত্যন্ত শান্ত গলায় আমার সাহায্য চেয়ে বলেন তাকে ধরে একটা রিকশা তুলে দিতে। আমি সাহস করে তার হাত ধরি। সৌভাগ্যবশত একটা রিকশাও পেয়ে যাই। তার অবস্থা দেখে আমি মানবতার খাতিরে তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। যতোটা বুঝতে পারছি এটা কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই তার কোনো শত্রু এ কাজ করেছে। যদিও তার বক্তব্য হলো, তার কোনো শত্রু নেই। না, তিনি যে দেশের বিখ্যাত কবি মাশুকুর রহমান তা আমার জানা ছিল না। হাসপাতালে ইমার্জেন্সীতে ঢুকে বুঝতে পারি আমি যাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি তিনি কবি মাশুকুর রহমান। না, তিনি আঘাতকারীকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। না, আমি তার কোনো আত্মীয়কে খবর দিতে পারিনি। তিনি বলেন, এ শহরে তার আপনজন কেউ নেই। কি বলছেন? এজাহারে আমি সই করব কিনা? কেন করব না? তবে এ মুহূর্তে থানায় না গেলে যদি চলে সকালে এসে সই করে দেবো। আপনাকেও ধন্যবাদ খোদা হাফেজ।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখা মাত্র ডাঃ আদিল খুব বিব্রত চেহারায় সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'সরি, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি যেভাবে কবিকে নিয়ে এলেন ভাবলাম বুঝি আপনি মিসেস মাশুক।'

'তাতে কি, কেউ না কেউ ত তাকে এখানে নিয়ে আসত। এখন দয়া করে লিখে দিন পেসেন্টের জন্য বাইরে থেকে কি কি ওষুধপত্র কিনে আনতে হবে।'

'আপনিআনবেন?'

'আমি কবিকে কথা দিয়েছি কাল সকালে তাকে এক নজর দেখে যাব। তার যখন এ শহরে স্বজন কেউ নেই তখন সামান্য কটা ওষুধ কে আর কিনে দেবে?'

'ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি। কবি টবিরা দেখছি খুবই ভাগ্যবান হয়।'

ডাঃ আদিল হেসে টেবিলে রাখা প্রেসক্রিপসন স্লিপ টেনে নিয়ে লিখতে লাগলেন। দিশা এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'ভাগ্যবান না হলে কি কেউ বলা নেই কওয়া নেই পথ চলতে চলতে খুনীর পাল্লায় পড়ে?'

'হ্যাঁ, ঘটনাটায় আমিও কিন্তু খুবই অবাক হচ্ছি? কৈশোর কাল থেকে আমি মাশুককে চিনি। একই শহরের ছেলে তো আমরা। সারাদিন বই নিয়ে থাকতো। কোনো খেলাধুলা বা আনন্দ ফূর্তিতে যোগ দিত না। মাঝে মধ্যে কবিতা টবিতা লিখে স্কুল ম্যাগাজিনে দিত। আমিই ছিলাম ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সে সূত্রে মোটামুটি ভালোই আলাপ পরিচয় ছিল। বাপ ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের হেড ক্লার্ক। কুমিল্লা শহরের পশ্চিম দিকে সাতউড়া বলে একটা মহল্লায় বাড়ী। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। তাকে কে এমনভাবে হত্যার চেষ্টা করতে পারে আমিত বুঝতেই পারছি না? ছিনতাই হলে না হয় বুঝতাম এটা একটা দৈনন্দিন বিষয়। এখন তাকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে বলতে হবে।'

ডাক্তার দিশার হাতে প্রেসক্রিপসনটা ধরিয়ে দিলে দিশা দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তাহলে আসি?'

'আসুন, আপনার মত দয়ালু মহিলা সচরাচর আমাদের দেখার ভাগ্য হয় না।'

'তাই নাকি? আপনাকে ধন্যবাদ।'

দিশা সকাল ন'টায় একটা ক্লাস নিয়েই কলেজ থেকে বেরিয়ে মার্কেট থেকে ওষুধগুলো কিনে রিকশায় চাপল। একবার ভেবেছিল ছোটো বোনটাকে সঙ্গে নিয়ে মেডিকেল যাবে। কিন্তু গতরাতে সন্ধ্যার এই দুর্ঘটনার কাহিনী ছোটো বোন ও ভগ্নিপতিকে বলায় প্রথমে দু'জনই আতকে উঠলেও পরে ইমার্জেন্সীর ঘটনা এবং আহত ব্যক্তির পরিচয় জেনে উভয়েই অবাক হয়ে একটু মুচকি হাসল। বোন নিশানা ত বলেই ফেলল, 'বুবু তোর এই ফাঁড়া সহজে কাটবে বলে ত মনে হয় না। কবির সাথে কান্ড যখন তখন শত কবিতায় তোকে আল্লাহ সাঁতার না কাটিয়ে সহজে না ছাড়ুন এই দোয়া করি।'

'এই নিশা দোয়াটা কাল সকালে হাসপাতালে গিয়ে করবি? আমি কথা দিয়ে এসেছি, কাল সকালে আমার ছোটো বোনকে নিয়ে তাকে এক নজর দেখতে আসব। যাবি?'

না বাবা, হাসপাতলে গেলেই আমার গা গোলায়। তাছাড়া এসব ব্যাপারে একজনই যথেষ্ট। দু'জনে বেচারার দিশেহারা অবস্থা হবে।'

নিশার জবাবে তার স্বামী শব্দ করে হেসে ফেললে দিশা বলল, 'আশ্চর্য তো। এমন একটা ভয়াবহ ঘটনার মধ্যে যে এমন মজার আন্দাজ– অনুমান তোরা সবাই আবিষ্কার করবি তা কিন্তু আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। আগে জানলে ছুরি খাওয়া মানুষটাকে পথে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচতাম।'

নিশা এবার বোনের হাত ধরে ফেলল, 'শোন, কাল সকালে একটা জরুরী কাজের তাগাদা অফিসে না থাকলে অবশ্যই তোর সাথে যেতাম। কাল তুই গেলে ভদ্রলোককে আমাদের বাসায় একবার আসতে বল না? এতটা উপকার যখন আমাদের পক্ষ থেকে হল তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।'

দিশা আর কথা বাড়ায়নি।

এখন ওষুধপত্র কিনে রিকশায় চেপে তার কেমন যেন লজ্জা লাগছে। দিশা কি শুধু কর্তব্যের খাতিরেই যাচ্ছে না তবে? মাশুক অসাধারণ কবি প্রতিভা, দিশা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা বলেই যে তা জানে এমন নয়। যখন সে ছাত্রী ছিল কলেজে পড়ত তখন থেকেই মাশুকের কবিতার সাথে তার কমবেশী পরিচয় ঘটেছিল। দু'একটা লাইন তখন থেকেই মুখস্থ বলতে পারত। পরে তার দু'চারখানা কবিতার বইও দিশা কলেজের চাঁকরিতে আসার পর জোগাড় করেছে। মনে হয়েছে উপমা ও রূপক ব্যবহারে এক অসাধারণ প্রকৃতিবাদী কবির আবির্ভাব হয়েছে আমাদের ভাষায়। তার মতো ভক্ত তো কবির কতোই আছে। কিন্তু দৈব ঘটনার মতো গতকাল যে তিনিই ছুরিকাহত হয়ে দিশার সামনে পড়ে যাবেন এটা যতোই কাকাতালীয় হোক, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ছোটো বোন, ভগ্নিপতির ঠাট্টাটা না হয় হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় কিন্তু ডাক্তার আদিল? তিনি কেন দেখা মাত্রই ভাবলেন দিশা মাশুকের স্ত্রী? হাসপাতালে নেয়ার সময় দিশার আচরণে কি তেমন ঘনিষ্ঠতা তার চোখে পড়ছে যা মুহূর্তের মধ্যে বিচার–বিবেচনা না করেই বুদ্ধিমান মানুষ দিশার মতো এক অবিবাহিতা যুবতীকে কারো স্ত্রী ভেবে বসলেন? অবশ্য তার আত্মীয় স্বজনই দিশারী বড় না নিশানা বড় এনিয়ে সন্দেহে পড়েন। কারণ নিশা বি,এ পাস করেই ব্যাংকের চাকরি নিয়ে তার এক সহকর্মী ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করে ফেলে। দিশা তখন বাংলায় অনার্স শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেসন জটের ঘোল খাচ্ছে। এম,এ নিয়ে বেরুতে আরো কয়েক বছর লেগে যায়। তারপর তো কলেজের চাকরি। মানুষের তাকে নিশানার ছোটো

ভাবা বিচিত্র ভাবে না দিশারী। ভাবুক।

দিশার রিকশা এসে মেডিকেলে ঢোকার পথে ডাক্তার আদিলের সাথে দেখা। ডাক্তার একটা মাইক্রোবাসে চাপছিলেন। দিশাকে দেখেই দাঁড়ালেন, 'আপনার রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। আজ বিকেলেই চলে যেতে বলেছি। সারারাত নাকি দুঃস্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে। চোখ বন্ধ করলেই নাকি দেখছে একটা ছুরিওয়ালা কালো হাত। ও কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে। আপনি ওষুধ নিয়ে ওপরে যান।'

দিশা ডাক্তারের সাথে সালাম বিনিময় করে দ্রুত ওপরে উঠে এল।

কেবিনের পর্দা সরাতেই মাশুক অস্বাভাবিক আর্তকণ্ঠে 'কে, কে?' বলে বিছানায় উঠে বসল। চোখেমুখে কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব।

দিশা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কেমন আছেন আজ?'

'ও আপনি। আমি ভাবলাম।

'কি ভাবলেন?'

'ভাবলাম, কেউ না আবার ছুরি মারতে হাসপাতালে এসে ঢুকেছে?'

'সেকি এখানে কার সাহস আপনাকে মারতে আসে? এমন অস্বাভাবিক চিন্তা করছেন কেন?'

অবাক হয়ে মন্তব্য করল দিশা। তার মনে হল কালকের সাহসী মানুষটার সাথে এ মুহূর্তের ভীতত্রস্ত মাশুকের কোথায় যেন একটা ফারাক ঘটে গেছে। এক রাতের মধ্যে এমন কি ঘটল দিশা বুঝতে না পেরে মাশুকের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

'দুর্ভাবনা যায় না। কেউ আমার শত্রু নয় অথচ কাল ঐ গলিটায় কে আমাকে ছুরি মেরে পালাল? অথচ আমার পকেটে টাকা, হাতে ঘড়ি আর বুকে দামী কলম ছিল। কিছুই নিল না। কে আমাকে মেরে ফেলতে চায়?'

এমন আর্তকণ্ঠে মাশুক কথাগুলো বলল, দিশা এগিয়ে অনেকটা আত্মীয়ের সান্ত্বনার ভঙ্গিতে তার বেডের পায়ের কাছে বসল।

'কবি হলেই কেউ অজাতশত্রু হয় না।'

'কিন্তু আমার সাথে বৈরিতা করার মতো কোন ধন সম্পদ জমিজমা বা বিষয় সম্পত্তি তো আমার নেই। যদি কিছু থাকে তবে তা কবিতা লেখার ছেলে মানুষী। যাকে আপনারা প্রতিভা বলেন। আমাকে কেউ মারবে কেন বলুন? তাও আবার প্রাণে মেরে ফেরতে চাওয়া?'

দিশা মাশুকের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সাইড ডেস্কের ওপর ওষুধগুলো সাজিয়ে রাখতে লাগল।

দুর্ঘটনা ঘটার পর এই প্রথম মাশুক তার সাহায্যকারিণীর দিকে তাকাবার একটু ফুরসৎ পেল। দিশাকে তার বেশ সুন্দরী বলেই মনে হলো। এখন দিশার পরনে একটি লাল পাড়ের গোলাপী সিলকের শাড়ি। গাঢ় খয়েরি রংয়ের ব্লাউজ। তেমন স্বাস্থ্যবতী না হলেও, ছিপছিপে দোহারা গড়ন ও ফর্সা গায়ের রংয়ের জলুসে দিশাকে চমৎকার মানিয়েছে। কানে বা গলায় কোন গয়না নেই। তবে বা হাতের বদলে ডান হাতে একটা সোনালী ব্যান্ডের সিকো ঘড়ি। মাথার চুল টান করে পেছনে একটি বিশাল খোঁপা। খোঁপা দেখে মনে হয় মহিলা বেশ কেশবতী। মাশুকের দুর্ভাবনার কোনো জবাব না পেয়ে মাশুক নিজেই আবার কথা বলল, 'আপনি বলেছিলেন আজ বিকেলে আসবেন? সাথে আপনার ছোটো বোনকেও আনবেন। আজ কলেজে কোনো ক্লাস ছিল না বুঝি?'

'ছিল। একটা ক্লাস নিয়েই এসেছি। সকালে থানায় গিয়ে আপনার ব্যাপারে যে এজাহার দেয়া হয়েছে তা সই করার কথা ছিল আমার। আমি সে কারণেই কলেজ থেকে বেরিয়েছিলাম। ভেবে দেখলাম, থানায় যাওয়ার আগে এ বিষয়ে আপনার মতামত এবং আপনার অবস্থাটা জেনে যাওয়া উচিত। আর আমার বোন আপনাকে তার বাসায় দাওয়াত করেছে। সুস্থ হয়ে একবার আসবেন। আমার বোন বিবাহিতা। সোনালী ব্যাংকের বিজয়নগর শাখায় একটা কেরানীর কাজ করে। আমি একা বলে তাদের সাথেই থাকি।'

কথা বলতে বলতে দিশা একবার চোখ তুলে মাশুককে দেখল। লম্বাটে চিবুক, উন্নত নাক এবং প্রসারিত লালাটের ফর্সা সম্প্রতিভ চেহারা। একটা চাদর টেনে শরীর আড়াল করে রাখলেও তার প্রসারিত ছাতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যে কাঁধটা আহত হয়েছে তা যে মেদহীন স্কন্ধদেশের শক্তির আকর তা এক নজরেই দিশা আন্দাজ করতে পারল। এ ধরনের পুরুষের সহজে ঘাবড়ে যাওয়ার কথা নয়।

'আপনাকে খুন করতে পারে এমন শত্রু আপনার নেই বলছেন অথচ যে বা যারা আপনাকে আঘাত করেছে তারা বেশ ভালোভাবেই জানত এ আঘাতে আপনি মরে যেতেও পারতেন। একটু চিন্তা করে দেখুন না, শত্রুতা না হোক

কারো এমন বিরক্তির কারণ হয়েছিলেন কিনা যে এমন কাজ করতে পারে?'

'দেখুন আমার জ্ঞান হওয়ার পর গত রাত থেকে এ পর্যন্ত সর্বক্ষণ এ চিন্তাই করছি। কে আমাকে মারতে পারে? ছিনতাইয়ের ব্যাপারে তো কোনো কথা নেই। এ শহরে যে কোনো রাস্তায় ছিনতাই হতে পারে। ছিনতাইকারীরা ছুরি মেরে দিতে পারে। কিন্তু আপনাকে আমি হলফ করে বলতে পারি, যে লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিনতাই ছিল না। তবে সে যখন আমাকে মারে অর্থাৎ ঘাড়ে ছুরিটা বসিয়ে দ্যায় তখন সে আমাকে 'শালা' বলেছিল। এখন মনে পড়ছে সে 'শালা কবি' বা 'শালা কবির বাচ্চা' এ ধরনের একটা শ্লেষাত্মক বাক্য উচ্চারণ করেছিল।

এখন ঘটনাটার খুঁটিনাটি আবার মাশুকের চোখেমুখে এবং মননে প্রতিচ্ছবি হয়ে ভাসছে।

'আপনি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন?'

'প্রথম আমার দিক থেকে কি করে বাধা দেব? আমি কি জানতাম কেউ অন্ধকারের ভেতর আমাকে ছুরি মারতে দাঁড়িয়ে আছে? হঠাৎ বাকীধে ছুরিটা পোশাক কেটে বসে যাওয়ায় মাত্র আমি উহ্ করে রাস্তায় বসে যাই। আততায়ী আমার ওপর হুমড়ি পড়ে গেলে আমি তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি। ছুরিটা তখন ছিটকে আলোর কাছে গিয়ে পড়ে। লোকটা প্রাণপণ চেষ্টায় আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ছুরিটা তুলে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তার মুখ থেকে একটা কথা আমার কানে আসে "যাহ শালা তোর কবিগিরি খতম।" এ কারণেই ভাবছি এটা কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। খুনী আমাকে চেনে এবং আমি যে কবি তাও তার অজানা নয়।'

এবার মাশুকের কণ্ঠে তার আতংকিত অবস্থাটা ধরা পড়ল।

'কাল আপনাকে বেশ সাহসী মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে আপনি বেশ ভীত আর চিন্তিত। আমি অবশ্য স্বীকার করি আপনার ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ এ ঘটনায় নিশ্চয়ই আছে। তবুও আপনাকে বলি আপনি ভয় পাবেন না।'

'আমি প্রকৃতপক্ষে ভাবছি যে বা যারা আমাকে মারতে চেয়েছিল তারা আবার চেষ্টা করবে কিনা? দৈবাৎ আমি কাল রক্ষা পেলেও, পরে যে পাব এর নিশ্চয়তাই বা কি? যারা আমাকে শেষ করে দিতে চায়, আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগটা কি– এটাও আমার মনে ভীতির সৃষ্ট করেছে। আপনি কি মনে করেন আমার ভয় বা দুশ্চিন্তাটা অস্বাভাবিক?'

'মোটেই অস্বাভাবিক নয়।'

'এ অবস্থায় আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলছেন কি করে?'

'তা বলে হাসপাতালে এসে কেউ আপনাকে ছুরি মারবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'এ মুহূর্তে আমি হাসপাতালে কিন্তু আজ বিকেলে ছাড়া পেয়ে বাসায় যাব। বাসায় আমি একা থাকি। একা রেঁধে বেড়েই খাই। দৈনিক কয়েক ঘন্টার জন্য একটা পাক্ষিক পত্রিকায় কাজ করি। একা নির্ভয়ে এতোদিন চলাফেরা করেছি। এখন পথে বেরুলেই সন্দেহ না জেগে পারবে না খুনীরা আমার অনুসরণ করছে কি না। আমার অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন।'

'এভাবে চিন্তা করলে কি চলে?'

'আপনি বলতে চান মৃত্যুর পরোয়ানা কাঁধে নিয়ে আমি ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াব?'

'এখন তো অন্তত আপনার জন্য অন্য কোনো পরামর্শ নেই কবি সাহেব। আমরা যখন সবাই জানি, যে কোনো মুহূর্তে আমার আপনার মৃত্যু হতে পারে। তখন বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলোকে ভয়শূন্য করার একটা দাওয়াই থাকতে হবে। আমি জানি এ কথায় আপনার উদ্বেগ যাবে না। তবুও বলছি, ভয় পাবেন না। আর আজ বিকেলে না হয় নিজের বাসায় গেলেন না।'

'তাহলে আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে বলেন?'

'আপনার এ শহরে আপনজন কেউ না থাকলে ---'

'আপনাকে তো আগে বলেছি, ঢাকায় আমার আশ্রয় পাওয়ার মতো আপন কেউ থাকেন না। দু'একজন একই ধ্যান-ধারণার কবি আছেন বটে কিন্তু তাদের নিজেদেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। তাদের বিপদগ্রস্ত করাও তো আমার পক্ষে অমানবিক কাজ হবে। আমি আজ আমার নিজের বাসায়ই গিয়ে উঠতে চাই। তবে নির্ভয়ে বাস করার আর উপায় রইল না, এই আর কি।'

অনেকটা গা ভাসিয়ে দেয়ার মতো কথাবার্তা।

দিশা কবির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না। ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাতক আপন মনেই আবার কথা বলতে লাগলো।

'আর এক কাজ করলে পারি, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা কুমিল্লায় নিজের

গায়ে ফিরে যেতে পারি। সেখানে সম্ভবত ছুরির ভয়টা কিছু ধাওয়া করবে না।'

এবার দিশা হেসে ফেলল, 'সেকি গাঁয়ে ফিরে যাবেন কেন? গাঁয়ে ফিরে গেলে আপনার কবিতা লেখার কি হবে? আপনি কত বড়ো কবি। সারা দেশ জানে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যাবেন?'

'পালিয়ে যাচ্ছি কোথায়? আমি কি কারো সাথে লড়াইয়ে নেমেছি যে পালানোর কথা উঠছে? কি যেন আপনার নাম –'

' সৈয়দা দিশারী মালিক – দিশা–'

'মিস দিশা, আপনি এক অসাধারণ সাহসী এবং নাগরিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহিলা। যেভাবে গতকাল আপনি আমাকে হাসপাতালে এনে পৌঁছালেন তা কোনোদিন ভুলে যাবার মতো নয়। আমি এ জন্যে কোনোদিন ভুলবো না। একটা কথা জানবেন মানুষ সব অবস্থায় সৃজনশীল কাজকর্ম, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা কিংবা সংগীতে সুর সৃজন ইত্যাদি মানবিক রচনা উদ্ভাবনার দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু পারে না শুধু জীতদাস অবস্থায় বা আবহাওয়ায়। আমার মধ্যে যতোক্ষণ এই ভয় কাজ করবে ততোদিন আর কবিতার মতো মানবিক অনুভূতির একটি মাত্র লাইনও লেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া কারা আমার মতো একজন সামান্য কবির জীবন নিতে চায় তা না জানা পর্যন্ত আমি আর কবিতা লিখতে চাই না।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে মাস্তক বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল এবং দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখল। দিশা অবস্থাটা উপলব্ধি করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে আজ বিকেলে নয়, এখনই আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে চাই। আপনি তো এখন বেশ সুস্থই আছেন। বিকেলের বদলে এখনই হাসপাতাল ছাড়তে অসুবিধে কি? যাওয়ার সময় না হয় রমনা থানা হয়েই যাব। থানার চার্জে যিনি আছেন ডাক্তার আলিল বললেন, তিনিও আপনার পরিচিত। ইন্সপেক্টর নবী। যাবেন আমাদের বাসায়?'

'আপনাদের বাসায়?'

'দোষ কি? আমরা আত্মীয় না হলেও মন্দ লোক নই। কোনো বদ মতলব নিয়ে আপনাকে যেতে বলছি না। কয়েকজন কবিভক্তের মধ্যে থাকলে কে জানে আপনার ভয়ও হয়তো বা কেটে যেতে পারে।'

'আমার দুর্ভাগ্যের ভার আমি কেন আপনার ওপর চাপাবো? তাছাড়া আমার সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।'

'আপনার কবিতা থেকে আপনাকে যতোটুকু জানি, তাতে আমার বা আমার বোনের চিন্তিত হওয়ার কিছুই দেখি না। আমার সম্বন্ধে যদি জানতে চান, আমি একজন অবিবাহিত মহিলা। শিক্ষকতা পেশা। ছোট বোন বিবাহিত, সুখী ও সুন্দরী। স্বামীটিও অমায়িক। প্রশ্ন জাগতে পারে আমি বিয়ে করিনি কেন? আমি শিক্ষা শেষ করেছি দেশীতে। পরিচিত কেউ আমাকে জানায়নি যে আমাকে তার পছন্দ। সে কারণে আমার বিয়েটা হয়নি। আমাকে যদি কেউ বলতো আমাকে তার ভালো লাগে, আমি বিবেচনা করতাম। আমারো পছন্দ হলে কুমারী থাকতাম না। এ কথায় ভাববেন না আপনাকে উস্‌কাচ্ছি। আমি প্রকৃতপক্ষে আপনার কবিতার ভক্ত। ভক্তের বাড়িতে যদি না যান তবে বোনের বাড়ি ভেবেও যেতে পারেন। ভেবে দেখুন, আমি নীচে গিয়ে আপনার কেবিনটা ক্যানসেল করে আসি।'

দিশা পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মাশুক অবাক হয়ে ভাবল এমন পরোপকারী মানুষও তাহলে এই আতংকের রাজধানী ঢাকায় আছে? সে পিঠের তলা থেকে বালিশ সরিয়ে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে কাঁধে এক ধরনের টানজনিত ব্যথা অনুভব করল। তার মনে হলো ক্ষতস্থানটায় ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকায় বাহুর পেশী কোথাও সংকুচিত হয়ে আছে। তবুও যতোটা সম্ভব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সে সোজা হয়ে বসলো। কিছুক্ষণ পরে একজন নার্স এসে বলল, 'আপনাকে এখন শেষ ইনজেকশন দিতে এসেছি। হাতটা তুলুন।'

'শেষ কেন?'

'কোর্স এই এ্যাম্পলেই শেষ। তাছাড়া এক ভদ্রমহিলাকে তো দেখলাম এখনই নীচের অফিসে কেবিন ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছেন।'

দিশা তার কেবিন ভাড়াও মিটিয়ে দিচ্ছে শুনে একটু কেমন যেন সংকুচিত বোধ করলো মাশুক। কিন্তু নার্স ইনজেকশন হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাঁহাতটা উঁচু করে ধরলো। নার্স পুশ করতে গিয়ে বললো, 'সাবধানে চলাফেরা করবেন। শহরটা খুনী আর বদমাশে ভরে গেছে। তা না হলে আপনার মতো কবি মানুষকেও কেউ আবার ছুরি মেরে দেয়?'

সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে ছুঁচের জায়গাটায় আঙুল দিয়ে ম্যাসেজ করতে করতে বললো নার্স।

'আমি যে কবি মানুষ তাও জানেন দেখছি?'

'সবাই তো জানে। গতকাল খবরের কাগজেও তো উঠেছে। লিখেছে কবি মাশুকুর রহমান অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির দ্বারা ছুরিকাহত।'

নার্সের কথায় এবার মাশুক একটু চমকে উঠল। সর্বনাশ সারা শহরে তাহলে তার ওপর আক্রমণের খবরটা চাউড় হয়ে গেছে? কে একাজ করলো? যদিও মাশুক জানে এ ধরনের খবর চাপা থাকে না। পত্রিকা কাগজগুলোর সিটি রিপোর্টাররা হয় হাসপাতাল অথবা থানাসমূহের বরাত দিয়ে প্রাত্যহিক আপতিক ঘটনার বিবরণ ছেপে যায়।

নার্স চলে গেলে মাশুক একটু দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তির মধ্যে দিশার অপেক্ষা করতে থাকল। মেয়েটা তো অদ্ভুত। বলে কিনা ভক্ত ভেবে এমনিতেই যদি তাদের বাসায় গিয়ে উঠতে মাশুকের আপত্তি লাগে তবে সে না হয় বোন ভেবেই তাদের আশ্রয়ে উঠুক। মাশুক ভাবতে পারছে না এখন তার কি করা কর্তব্য? সত্য বলতে কি নিজের বাসায় গিয়ে এখন এই আহত গর্দানটা নিয়ে একাকী গড়াগড়ি করতে তারও ইচ্ছে নেই। তাছাড়া আততায়ীর দ্বিতীয় আক্রমণের ভয়ও তাকে একেবারে ছেড়ে যাচ্ছে না। যদিও জানে এ ধরনের ভয়ের প্রকৃত পক্ষে যুক্তি থাকলেও সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কমই। তবুও মাশুক স্মরণ করতে চেষ্টা করলো আক্রমণের সময় লোকটাকে সে যখন জাপটে ধরে ফেলেছিলো। তখনো বদমাশটা অনবরত কবিতাকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছিল, "আত্তুমারি তোর কবিতা, তোকে আর তোর কবিতাকে শালা আই ... দেম্ হানরেড টাইমস। এই শহরটাকে তোরা নোংরা বানিয়ে ফেলেছিস শালা ...' ইত্যাদি।

এখন মাশুকের দুর্ঘটনার সময়কার বিহ্বলতা যেন অনেকটাই কেটে যাচ্ছে। সব কথা মনে পড়ছে। লোকটার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবীর ওপর খয়েরী ওয়াচ কোট ছিল। পরনে গরম কাপড়ের ঢোলা প্যান্ট। পায়ে পাম্পস্যু ছিল কিনা তা মাশুক লক্ষ্য করেনি। আর লক্ষ্য করবেই বা কি করে? রবীন্দ্রসংগীত গায়কদের মতো পোশাক পরে একজন লোক যে তাকে পেছনে থেকে ছুরি বসিয়ে দেবে এটা কি তার চিন্তার ত্রিসীমার মধ্যে ছিলো? যেটুকু আততায়ীর অবয়বের বিবরণ এখন তার স্মৃতিতে ভাসছে এটা যে-মাশুকের কবি দৃষ্টির ফলেই রিকালেক্ট করা সম্ভব হচ্ছে তা সে উপলব্ধি করলো। লোকে বলে কবিদের নাকি একটা তৃতীয় নয়ন থাকে। কোথায় থাকে সে নয়নটা? বুকের ভেতর না কপালের ওপর অদৃশ্যভাবে? মাশুক অবচেতনভাবেই ললাটরেখার ওপর তার সুস্থ হাতটা একবার বুলিয়ে গেল। এতে এখন সন্দেহ নেই সুসংস্কৃত পোশাক পরা জনৈক আততায়ী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাশুকের চকিত চেতনায় এক মুহূর্ত আগে যে হঠাৎ মনে হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত গায়কের মতো হত্যাকারীর পোশাক-আশাক, এতে যেন মাশুক আরো নেতিয়ে পড়লো। সে আবার পিঠের নীচে বালিশটা ঠেসে দিয়ে শুয়ে পড়লো। এখন তার দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন নেই। সে যে কামরার ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এটা মাশুকের মনে হলো না। মাশুকের দৃষ্টি তখন এক আতংক বিহ্বল মুহূর্তের আত্মরক্ষাজনিত ধস্তাধস্তির মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে। লোকটার চেহারা অন্ধকারের মধ্যেও মনে হচ্ছিল বেশ ফর্সা এবং পালিশ করে কামানো। মাশুক নিজে কামানোর পর ওড স্পাইস আফটার

সেত মাখে বলেই লোকটার চেহারা যে পালিশ করে কামানো ছিল তা এখন অনুমান করতে পারছে। অনুমান করতে পারছে লোকটা আমরা যেমন ধারণা করি, অর্থাৎ হত্যাকারীর অথবা গুণ্ডা বদমায়েশের ধরন-ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাবি, এদের পরনে থাকবে জিনসের প্যান্ট এবং গায়ে চক্কর বক্কর রঙিন গেঞ্জী বা শার্ট আর গলায় রুমাল বাঁধা। মাশুকের ওপর আক্রমণকারীর বেশবাস তেমন ছিলো না। সে ছিল একজন সুসংস্কৃত বিদ্বান আততায়ী। যে কিনা কবিতা পড়ে এবং বোঝেও। বোঝে বলেই সে মাশুকের কবিতার হাত থেকে ঢাকা মহানগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হত্যার ছুরি তুলে নিয়েছে। তার ক্রোধও সে গোপন করেনি। ছুরি বসিয়েই সে বলে উঠেছিল 'শালা কবির বাচ্চা।'

মাশুককে হত্যা করতে এসেও সে বুদ্ধিজীবী বা বিদ্বান কিংবা বলা যায় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর বেশবাস পরিবর্তনের প্রয়োজনবোধ করেনি। মাশুক বুঝতে পারছে না, দ্বিতীয় বার ভদ্রলোক এটেম্পট্ নেবে কিনা? মাশুকের এখনি নিজের অজান্তেই হত্যাকারীকে ভদ্রলোক বলে ঠাওরে নিতে বাঁধছে না। বলা যায় হত্যাকারীকে মাশুক, নিজের ভেতরের নিরুচ্চার ভাষায় 'ভদ্রলোক' বলতে বাহ্যত বাধ্য হল যেন। কিন্তু বুঝতে পারলো না কয়েকটি প্রেম ও প্রকৃতির কবিতায় ঢাকা শহরটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি কেন মনে করছেন? আর শুধু মাশুক একাইতো কাব্যচর্চা করে না? এ শহরে কতো কবি, নিন্দুকরা বলে তাদের সংখ্যা নাকি কাকের চেয়েও বেশী। মাশুক ভেবে পায় না কবিতার মতো এমন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মানুষ কি করে এমন ক্রুদ্ধ হতে পারে? তাও আবার শিক্ষিত মানুষ? নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষা ছাড়া সমকালীন কবিতার অর্থ বুঝে রাগান্বিত হওয়ার ক্ষমতা সাধারণ নিরক্ষর লোক বা অল্পবিদ্যায় ভয়ঙ্করীদের নেই। তারা ভালো হোক, খারাপ হোক, কবিতা লেখার জন্য কবিকে হত্যা করার কথা কেউ চিন্তা করেছে বলে তা শোনা যায়নি। মাশুক এই সিদ্ধান্তে প্রায় নিশ্চিত হলো যে তাকে যে বা যারা হত্যা করতে চায় তারা কবিতা বোঝে।

ঘরে ঢুকে মাশুককে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে দিশা একটু অবাক হলো। তার হাতে কেবিনের বিল পরিশোধের রশিদপত্র।

'কি ব্যাপার, আপনি এখনও শুয়ে আছেন? আমার সাথে আমাদের বাসায় যেতে মন চাইছে না বুঝি? যদি আপত্তি থাকে, না গেলেন। বলুন আপনাকে তাহলে ইস্‌কাটন রেখে আসি।'

দিশার কথায় মাশুকের হঠাৎ আকাশ-পাতাল বিচিত্র ভাবনার জট ছিঁড়ে গেল। সে আবার লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'আপনার সাথে আপনাদের

বাসায় যাব। চলুন। তার আগে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো ঐ জামাটা আমাকে একটু কষ্ট করে পরিয়ে দিন। আয়া গতকাল রক্তমাখা শার্টটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ঐখানে শুকোতেদিয়েছে।'

দিশা হ্যাঙ্গার থেকে শার্টটা পেড়ে এনে হাত ঢুকিয়ে উল্টে নিয়ে বলল, 'নিন বাঁ হাতটা ঢোকান। ডান হাত ঢোকাতে হবে না, এ পাটটা কাঁধের ওপর রাখুন।'

মাশুক নির্দেশ মান্য করলো। দিশা বললো, 'আমি কেবিন ভাড়া শোধ করে দিয়েছি। আয়াদের বকশিসও চুকিয়ে এসেছি। ঋণটা পরে আমাকে শোধ করে দিলেও চলবে। না পারলে একটা কবিতার বইই না হয় উৎসর্গ করে দেবেন।'

দিশার হাসিটি চমৎকার। এই প্রথম, এখানে আসার পর একজন সুন্দরী মহিলার পরিপূর্ণ খুশীর অভিব্যক্তি দেখে মাশুকের কবিমন পুলকবোধ করলো।

'আপনি খুব সুন্দরভাবে হাসেন।'

কবির প্রশংসা বাক্যে দিশা কেমন যেন একটু আরক্তিম আভায় ভরে যেতে লাগলো। এগিয়ে এসে মাশুকের আরো কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'দেখুন চেষ্টা করে একাকী সিঁড়ি বেয়ে নামতে পারেন কিনা?'

'পারবো না মনে হয়। আপত্তি না থাকলে আপনার হাতে একটু ভর রেখে নামবো। এখন অবশ্য বোনের হাত ভেবেই স্পর্শ করবো। কি করবো বলুন, এতোটা যখন সহ্য করলেন। এটুকুও না হয় আপনার প্রিয় কবির হ্যাংলামো বলেই সহ্য করে যান।'

কাতর মিনতির মতো শোনালো মাশুকের কথা। দিশা এবার আর হাসলো না। নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাশুককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, 'শক্ত হয়ে একটু দাঁড়ান। আমি জুতো জোড়া পরিয়ে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

মাশুক অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ধপ করে আবার বেডের ওপর বসে পড়ে বললো, 'না পারছি না।'

'ঠিক আছে বসুন। আগে মোজা দুটি পায়ে ঢোকান।'

দিশা মোজা জুতো পরিয়ে টেনে ফিতে বাঁধার সময় একবার মুখ তুলে কবির দিকে তাকালো। মাশুক অবাক হয়ে দিশার সযত্ন সেবার দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হওয়াতে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, 'কবিতার জন্য যারা আমাকে খুন করতে চায়। তারা এ মুহূর্তে কবিতার জন্য আমি যা পাচ্ছি অর্থাৎ এক অচেনা মানুষের যত্নের হাতদুটি। এদৃশ্যে নিশ্চয়ই হাত থেকে ভদ্রলোকের ছুরিটা পড়ে যেতো।'

'যারা আপনাকে খুন করতে চায় তাদের আপনি ভদ্রলোক বলছেন? আপনি সত্যি খুব বড় কবি!'

'ও আপনাকে বলা হয়নি। বলা হয়নি মানে এ পর্যন্ত আক্রমণকারীর হুবিসুরতের বিবরণ আমি নিজেই রিকালেক্ট করতে পারছিলাম না। একটু আগে হঠাৎ মনে পড়লো যে ব্যক্তি আমাকে মারতে চেয়েছিল তার পরনে ছিল খুব ধূপ-দুরস্ত সিল্কের পাঞ্জাবী, খয়েরী জেকেট, দামী প্যান্ট আর পাম্পস্যু। একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর মতো ড্রেস। আর খুব সুপুরুষ দেখতে। এখন আরো যতোটুকু মনে করতে পারছি, তার শরীরের বাতাসে সেন্টের সুগন্ধ পেয়েছিলাম। এমন বুদ্ধিজীবীর মতো হত্যাকারীকে আপনি কি গুণ্ডা বা দুর্বৃত্ত বলতে পারেন? তাছাড়া তিনি আমাকে আমার কবিতার জন্যই কিংবা বলা যায়, আমার কবিতার হাত থেকে নাগরিক জীবনকে রক্ষার জন্যই আমাকে ছুরি মেরে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এমন একজন সমঝদার লোককে আপনি আমি ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করতে ন্যায়ত বাধ্য নই কি?'

মাশুক সুযোগ পেয়ে এবার দিশাকে আততায়ীর শারীরিক বিবরণ দিল। যদিও মাশুক 'ভদ্রলোক' শব্দটি উচ্চারণ করেছে একটা অবচেতন প্রচলিত বোধ থেকেই।

দিশা বলল, 'থামুন তো, নিন আমার কাঁধটা ধরেই দাঁড়ান। দেখবেন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমাকেও আবার ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন না। অতোবড়ো একজন পুরুষের ভার সয়ে নামতে পারবো কিনা আল্লাহ জানেন! বিসমিল্লাহ, চলুন।

দিশা ও মাশুক একটা রিকশা নিয়ে সোজা রমনা থানার গেটে এসে দাঁড়াল। দিশা বললো, 'নামুন এখানে এজাহারটা সই করে যেতে হবে।'

'তাতে কি ফল হবে?'

'কিছু হবে না জানি, তবুও আপনাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইছে এ অভিযোগের একটা রেকর্ড তো থাকবে। আইন- কানুন নেই কিন্তু থানা- পুলিশ তো আছে? ভেতরে চলুন, এখানে নবী সাহেব নামে একজন পুলিশ অফিসার আপনাকে চেনেন।'

'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ। সেদিন টেলিফোনে কথা হলো। ইনিও কুমিল্লার। ছাত্রাবস্থায় আপনারা একই স্কুলে পড়তেন।

'বাহ, আপনি তো আমার ব্যাপারে অনেকখানিই জেনে ফেলেছেন দেখছি।'

বিস্ময় প্রকাশ করে দিশার কাঁধে ভর রেখে মাশুক থানার অফিসরুমে এসে ঢোকামাত্রই পুলিশ ইন্সপেক্টর নবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আরে আসুন কবি। আপনার একসিডেন্টের খবর শুনে খুব দুঃখিত হয়েছি। ইনি নিশ্চয়ই মিস দিশারী মালিক। বসুন।'

মাশুককে বসার জন্যে একটা চেয়ার টেনে দিয়ে দিশা–নবীর দিকে মুখ তুলে বললো, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমিই গতকাল আপনার সাথে টেলিফোনে হাসপাতাল থেকে আলাপ করেছিলাম।'

'আপনারা একটু চা খাবেন। কবির শরীর এখন কেমন? বললো নবী।

মাশুক বললো, 'দুর্বল। এই ভদ্রমহিলার সাহায্য না পেলে খুব অসুবিধা হত। এখন এজাহারটায় কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে দিন সই করে দিচ্ছি।'

নবী ড্রয়ার থেকে কেস লিপিবদ্ধ করার খাতটা বের করে সামনে রেখে উল্টাতে লাগলো। হঠাৎ দিশার কি একটা মনে পড়ায় সে নবীর উদ্দেশ্যে বললো, 'নবী সাহেব গতকাল আপনার সাথে কথা বলার সময় একটা বিষয় বাদ পড়ে

গেছে। কবি সাহেবকে যে ব্যক্তি বা যারা ছুরি মেরেছে তারা সাধারণ ছিনতাইকারী নয়। তারা মাশুক সাহেবের টাকাকড়ি, দামী ঘড়ি ও কলম কেড়ে নিতে যায়নি। তারা তিনি কবি বলেই নাকি মারতে চেয়েছিলো। মারার সময় তাদের আক্রোশ তারা ব্যক্ত করেছিল তার কবিতার বিরুদ্ধেই। আঘাতকারীর মুখে তিনি যেসব শ্লেষাত্মক বাক্য শুনেছেন সেসবের মধ্যে একটা হল 'শালা কবির বাচ্চা,' 'আজ থেকে তোর কবিতা খতম' ইত্যাদি।

'বলেন কি?'

নবী কেস রেকর্ডের খাতা উল্টানো বন্ধ করে দিশার দিকে সবিস্ময়ে তাকাল।

নবীকে খুব অবাক হতে দেখে এবার মাশুকই মুখ খুলল, 'লোকটাকে যতোটা আমি দেখতে পেয়েছি তাতে সাধারণ ছিনতাইকারীর ধারণা পাওয়া যায় না। পোশাক গায়ক- শিল্পী বা কবিদের মতো। ধস্তাধস্তির মধ্যেই আমার আন্দাজ হয়েছে তার পরনে লম্বা পাঞ্জাবী এবং পরণে গরম কাপড়ের দামী প্যান্ট ছিলো। হত্যাকারী পারফিউম ব্যবহার করে। তার শরীর থেকে ইভনিং ইন প্যারিসের খুসবু বেরুচ্ছিল। চুল গর্দান পর্যন্ত নেমেছে। চেহারা অন্ধকারেও ফর্সা এবং কামানো বলে আমার পরে ধারণা হয়েছে। মোট কথা নবী ভাই, হত্যাকারীকে একজন ভদ্রলোক না বলে পারছি না।'

মাশুকের কথায় নবী এবার শব্দ করে হেসে ফেলল।

'আপনার বর্ণনা যদি সত্য হয় তবে আমিও স্বীকার করছি, মার্ডারার একজন ভদ্রলোকই ছিলেন। এমনকি আপনার মতো একজন খ্যাতনামা কবি হওয়াও বিচিত্র নয়। এখন কথা হলো, কবির মতো পোশাকপরা অই ভদ্রলোকটি আপনার মতো একজন নিরীহ ভদ্রলোককে কেন হত্যার চেষ্টা করবেন? প্রত্যেক পেশাতেই জেলাসি আছে। কবিতা লেখা এদেশে বোধহয় পেশা নয়। কি বলেন কবি সাহেব? আর যদি আপনাদের স্বপ্নের প্যাভেলিয়নেও পেশাগত জেলাসি ঢুকে থাকে তবুও তো একথা ভাবা যায় না সেটা এতোটাই হিংস্র হবে, এক কবি বা সাহিত্যসেবী অন্য এক খ্যাতনামা কবির ওপর ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভেবে দেখুন নিজেদের মধ্যে তেমন শত্রুতা আপনার কারো সাথে আছে কিনা? এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং কেস। আমার তৈরী এজাহারের নীচে আমি আপনাদের দেয়া হত্যাকারীর শারীরিক বিবরণটা যোগ করে দিয়ে আপনার স্বাক্ষর নেব। আপনি আপনার কবি বন্ধুদের এমন কোনো মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন কি?'

নবীর কথায় মাশুক লজ্জা পেলেও হেসে ফেলল, 'আমার তো তেমন কোনো

কিছু মনে পড়ে না– যাতে কেউ বলতে পারে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি। কবিতা লেখাটা আমার কোনো পেশা নয় যদিও কবিতা লেখা থেকে এক ধরনের অনিশ্চিত আয়ের কথাও আমি অস্বীকার করি না। হয়ত বছরে গোটা চল্লিশেক কবিতা লিখি। লেখা যেসব পত্র–পত্রিকায় ছাপা হয় তারা প্রতি মুদ্রিত রচনার জন্য কেউ একশো, কেউ দু'শো টাকা সম্মানী হিসেবে দেয়। আবার কেউ দেয়ও না। এটা আমার নিয়মিত আয়ের মধ্যে আমি ধরি না। বছরে একটা কাব্যগ্রন্থ বেরুলে, প্রকাশক যদি বন্ধু স্থানীয় কেউ হন, তবে হাজার দু'য়েক টাকা পাই। আমার পেশা মূলত সাংবাদিকতা। আমি একটা পাক্ষিকে কাজ করি। সেখানে হাজার সাতেক পাই। তাছাড়া অন্য একটা সাপ্তাহিকে সাংস্কৃতিক কলাম লিখে পাই হাজার তিনেক। সব মিলিয়ে হাজার দশেক টাকা। আমার মাসিক আয়। পৈতৃক সয়–সম্পত্তির সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আর তেমন কিছু নেইও আমার। সামান্য যা আছে আত্মীয়রা সেসব দেখাশোনা করে নিজেরাই ভোগদখল করে। কখনো ভাবে না যে আমি সেখানে কোনোদিন হস্তক্ষেপ করতে যাবো। বলুন, আমি কার মুখের গ্রাস কাড়তে যেতে পারি?'

মাশুকের কথা শেষ হওয়া মাত্র একজন সেপাই টেতে করে তিন কাপ চা এনে টেবিলে রাখলো। নবী বললো, 'কিছু মনে করবেন না কবি, একজন মহিলা সামনে আছেন বলতেও দ্বিধা লাগছে। আপনার আবার মহিলা ঘটিত কোনো ব্যাপার নেই তো? আপনাদের কবিদের তো থাকে, অর্থাৎ প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী?'

প্রশ্ন করে নবী এমন ভাবে হাসল, হতচকিত হয়ে মাশুক দিশার দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না। দিশা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। এদের বিব্রত অবস্থাটা উপলব্ধি করে নবী বলল, 'আরে এতে লজ্জার কি আছে? আমিও আপনার সম্বন্ধে সেই ছোটোকাল থেকে জানি। আপনার পারিবারিক সম্ভ্রমের বিষয়ও আমার অজানা নয়। একই স্কুলে পড়েছি। আপনাকে প্রকৃতপক্ষে একটু সাহায্য করতেই চাই। হাসিঠাট্টা করলেও ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি না নিয়ে পারছি না। আপনাকে একটা লোক বিনা কারণে ছুরি মেরে পালিয়েছে এটা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা কার্যকারণ থাকবে। আপনাকে প্রশ্ন করে সেই উদ্দেশ্যটাই ধরতে চাইছি। আমাকে অকপটে বলুন, এমন কাউকে ভালোবাসেন কিনা যা অন্য কেউ, যেমন ভালোবাসার মানুষটির আত্মীয়স্বজন কিংবা অন্য প্রেমিক পছন্দ করছে না?'

'না নবী ভাই তেমন কোনো সম্পর্ক কারো সাথে আমার নেই। তাছাড়া আমি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নই।'

এবার দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল মাশুক। মাশুকের জবাব শুনে দিশা একবার মুখ তুলে মাশুককে দেখেই দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল।

'এমন কোনো সংবাদ কি লিখেছেন যাতে অন্য কেউ ক্ষিপ্ত হতে পারে? এমন কোনো কবিতা?'

'ছুরি খাওয়ার মতো কোনো সংবাদ আমি কারো বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত লিখেছি বলে মনে পড়ছে না। তবে কবিতা হয়তো কারো উদ্দেশ্যে লিখেছি, সেটা প্রেমের কবিতা হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ বুঝবে তাকে নিয়েই লিখেছি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।'

'আপনি বলতে চান আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু নেই। শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে যারা আপনার দেশব্যাপী সুকবি হিসেবে সুনাম সহ্য করতে পারে না- এমন কেউ কি নেই ভাবেন? মানুষ তো আর অজাতশত্রু হয় না?'

'হ্যাঁ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে দুয়েকজন আছেন যাদের কবিতার আঙ্গিক ইত্যাদির বিষয় নিয়ে আমি একটু সমালোচনা মুখর। আমি বলি তারা বড়ো কবি নিঃসন্দেহে তবে আধুনিক কবি কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। দেখুন নবীতাই, এটা হলো সমকালীন সাহিত্যের একটা ইসথেটিক এবং আঙ্গিকগত দিকের সমালোচনা। আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমার কথা বেদবাক্য নয়। তাছাড়া আমি ক্রিটিকও নই, সামান্য কবি মাত্র। আমার কথার জবাব দেয়ার অবকাশ রয়েছে। এ কথার জন্য কেউ কাউকে হত্যা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে- এটা এক অসম্ভব ব্যাপার নয় কি?'

নিজের কথায় নিজেই চমকে দ্বিধান্বিত হয়ে গেল মাশুক। মনে মনে ভাবলো, আমি দুয়েকজনের কবিতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে দুয়েক জায়গায় সাহিত্য বিষয়ে আমার নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছি, এই ছুরিকাঘাত কি সেইসব মন্তব্যেরই পরিণাম? তা কি করে হবে?

'কোনোকিছুই কি আমাদের সমাজে অসম্ভব কবি সাহেব? প্রকাশ্য রাজপথে এই জনবহুল রাজধানী শহরে একজন গৃহবধূর গা থেকে গয়না তুলে নেয়া হচ্ছে ছুরি বা রিভলবারের মুখে। কারা তুলে নিচ্ছে? স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এ ধরনের অবস্থা কি দুয়েক দশক আগেও কেউ চিন্তা করতে পারতেন? এখন তা ঘটছে। ছাত্ররা যা পারছে তা তাদের শিক্ষকগণ কেন পারবেন না? আমি আপনি কেউ কি এ অবস্থায় সন্দেহের উর্ধ্বে? আপনি কবি মানুষ সমাজকে কিভাবে দেখেন বা দেখতে শিখেছেন জানি না। আমি পুলিশ, আমি জানি সমাজের

কোন দিকটায় পচন লাগার ফলে কি ঘটছে। কখনো ভাববেন না, আপনার সাহিত্য সঙ্গীরা আপনাকে ছুরি মারতে পারে না। নিন এজাহারের এ জায়গাটায় সই দিন।'

নবীর কথায় মাশুক মন্ত্রমুগ্ধের মতো এজাহারে সই দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। দিশা বলল, 'এবার আমাদের উঠতে হবে।'

মাশুক চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে দিশার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'নবী ভাই, খুনীরা আবার যদি আমার ওপর আক্রমণ করে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, দ্বিতীয়বার এ্যাটাক করতেও তো পারে?'

'তা পারে বৈকি। কিন্তু আমার ধারণা আততায়ী সহসা আপনাকে আর আক্রমণ করতে চাইবে না। কারণ সে জানে আপনি এখন থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। আপনি যে জীবনের ভয়ে এখন থেকে অতিশয় ভীত থাকবেন, এটাও সে জানে। যে আচরণের জন্য সে আপনাকে ছুরি মেরেছে, সেটা সাহিত্য সমালোচনা কিংবা প্রেমঘটিত যাই হোক না কেন, সে সেটার পুনরাবৃত্তি যদি না দেখে, তবে ভাববে ব্যাটা শায়েস্তা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় আক্রমণ নাও ঘটতে পারে। আপনি ত মনে হয় সে রকম মানুষ নন। মরবেন তবু মত বদলাবেন না। তাহলে একটু সতর্ক থাকবেন। আমি আপনার কেসটা নিজেই একটু খোঁজ খবর করে দেখব। এবার তাহলে আসুন।'

দিশা ও মাশুক উঠে দাঁড়াল।

মগবাজার মোড়ে এসে মাশুক সঙ্গীনীকে বলল, 'আপনি যদি দিকদারী মনে না করেন, তাহলে চলুন না আমার বাসায়? একটু কামরাটা গুছিয়ে আসব। তাছাড়া আপনাদের বাসায় গেলে আমারো তো কয়েকটা জরুরী জিনিস, দুয়েকখানা বইপত্র এবং কাপড়-চোপড় দরকার? আর গেলে আমার ঠিকানাটাও দেখা হয়ে যাবে। যাবেন?'

'ওমা এতে দিকদারীর কি আছে? ওই তো ইসকাটন। চলুন না। কবিরা কিভাবে থাকেন একটু বরং দেখেই আসি।'

'আপনি সত্যি অসাধারণ মহিলা। অন্য কেউ হলে একজন অপরিচিত লোকের জন্য এতোটা করতে সাহসী হতো না।'

'দেখুন কবি সাহেব, আমি তেমন কোনো অসাধারণ মেয়ে নই। আমার পরিচয়ও বলেছি। একজন অতি সাধারণ শিক্ষয়িত্রী মাত্র। আমার চরিত্রে যদি কোনো অতিরিক্ত কিছু দেখে থাকেন, সেটা আমার সাহিত্যপ্রীতি। আপনাদের

কবিতা পড়ি। গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিটা অন্য দশজনের মতো নয়। নয় বলেই সম্ভবত ভালো লাগে। সব শিক্ষিত মানুষেরই যে লাগে সেটা অবশ্য নয়। আমাদের কলেজে এমন অনেক শিক্ষিকা আছেন যারা বিষয়ের বাইরে একটা পাতাও উল্টে দেখেন না। আপনার বিপদে আমার সাহায্য পেলেন আপনি কবি বলেই। অন্য কেউ হলে হয়তো আমি ভয়েই এগোতাম না। আপনার লেখা পড়েই জানি আপনি দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন না। এমন কিছু আপনার কাছে পাব না যা শালীনতা বিরোধী। এটুকুই আমার সাহস। আর আপনি কেন বলছেন আপনি অপরিচিত ব্যক্তি। আপনি খুবই বিখ্যাত কবি। আপনার সামান্য কাজে আসতে পারাও আমার মতো মানুষের ভাগ্যের ব্যাপার। তবে আমার একটা ক্ষুদ্র কৌতূহল অবশ্য কবিদের ব্যাপারে আছে, তাহল কবিরা কেন নারীকে এতোটা গুরুত্ব দেন তাদের রচনায়? বাস্তবে সেকেন্ড সেক্স বলে সাহিত্যিক দার্শনিকগণ যাদের ডাকেন, তারা কিভাবে কবিদের কাছে এমন স্বপ্ন কল্পনাময় হয়ে ওঠে। যদি আপনার সাথে পরিচয়ের সুযোগে সেটা বুঝতে পারি, তবে আমার একটা বড়ো প্রশ্নের জবাব মেলে।'

দিশার কথায় মাশুক মৃদু হেসে বলল, 'মেয়েরা সুন্দর বলে।'

'কবিদের যে সব প্রেয়সী প্রিয়তমার কথা এপর্যন্ত জানা গেছে, তাদের সবাই যে অন্যের দৃষ্টিতে আহা মরি কোনো পরী ছিলেন, এমন তো মনে হয় না?'

কথা বলতে বলতে রিকশা ইসকাটনের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে পৌঁছুলে মাশুক বলল, 'বাঁদিকের গলিতে ঢুকতে হবে।'

রিকশাওয়ালা রিকশা ঘুরিয়ে গলিতে ঢুকে একটু এগোলেই মাশুক রিকশাকে থামতে ইঙ্গিত করে দিশার দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই নামতে হবে। সামনের বিল্ডিংয়ের চার তলায় আমি থাকি। রিকশাটা না হয় একটু অপেক্ষা করুক, আপনি আমার সাথে আসুন।'

দিশা মাশুককে হাত ধরে রিকশা থেকে নামাল। মাশুক প্রকৃতপক্ষে এখনো একাকী হাঁটতে অক্ষম। সে দিশার কাঁধে ভর দিয়েই চার তলার একটা তালাবদ্ধ ঘরের সামনে এসে থামল।

'আমার প্যান্টের পকেটে কোথাও চাবিটা আছে। আমি হাতটা এখন একদম নাড়াতে পারছি না। আপনি একটু কষ্ট করে চাবিটা পকেট থেকে বের করে তালাটা খুলুন।'

দিশা দ্বিধায় মাশুকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা বের করে এনে তালাটা

খুলে ফেলল। তালাটা কড়ায় লাগিয়ে দুয়ার ঠেলল। ঘরের ভেতরটা তেমন অন্ধকার নয়। সারা ঘরে বইয়ের স্তূপ। একটা ছোটো খাটের সামনে কার্পেট বিছানো। কার্পেটের চারদিকে সারি করে রাখা নানা বই। একটা ক্ষুদ্র টেবিল বিপরীত দিকের জানলার নীচে। সম্ভবত কবির লেখার টেবিল। একটা কাঁচের আলমারীতে রাখা গ্রন্থাবলী জাতীয় সোনালি টাইটেল লেখা গ্রন্থ কিতাব। খাটের উল্টো দিকের সেন্টার টেবিলে ছোটো পর্দার রঙীন টেলিভিশন সেট। নীচে ভিসি আর। একটা পানির সুরাই গ্লাস উল্টে মুখ ঢাকা। দড়িতে পোশাক আশাক ঝুলছে। সম্ভবত কবি এ ঘরটায় রাত্রিযাপন এবং পড়াশোনা করেন। এটাস্ট বাথরুম বেসিন।

দিশা ভেতরে ঢুকে মাশুককে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কয়টা কামরা নিয়ে থাকেন?'

'আড়াইটা। দুটো বেডরুম,. একটা রান্না খাওয়ার ঘর।'

'আপনি তো নিজেই রেঁধে খান বলছিলেন, কিচেনটা দেখিয়ে দিন ধোয়ার কিছু থাকলে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে যাওয়া দরকার। আগে নিজের এই পোশাকটা এক্ষুণি বদলান। ঘামে রক্তে গন্ধ হয়ে গেছে। এখন বরং একটা হালকা পায়জামা পাঞ্জাবী পরে নিন।'

কামরাটার চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল দিশা। মাশুক বলল, 'ঐ ওয়ার্ডরোপের একদিকে দেখুন শার্টপ্যান্ট ঝুলানো আছে। লুঙ্গীও আছে। দয়া করে একটু বের করে আনুন।'

ওয়ার্ডরোপ খুলে দিশা দেখল এতে হ্যাঙ্গারে অনেক ধুপদুরস্ত শার্ট প্যান্ট থাকলেও কোনো পাঞ্জাবী নেই। দিশার ধারণা কবিরা পাঞ্জাবীই পড়েন বেশী। কিন্তু এখানে কোনো সিল্ক বা সুতীর পাঞ্জাবী একেবারেই নেই দেখে সে অবাক হলো– ' কি ব্যাপার আপনার কোনো পাঞ্জাবী নেই বুঝি?'

'আমি পাঞ্জাবী টাঞ্জাবী পরি না।'

'সেকি?'

'মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে পাঞ্জাবী পরা খ্যান্ত দিয়েছি। আমি একদা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। নয় মাস মূলত পাঞ্জাবীদের দখলদারী, অত্যাচার ও হত্যার হাত থেকে মুক্তির লড়াই চালিয়েছিলাম। আমার যারা শত্রু ছিল তারা পাঞ্জাবী সামরিক জান্তা। আমার হঠাৎ একদিন মনে হলো লড়ছি যে শত্রুর সাথে, তাদের জাতিগত

নামের সাথে সম্পর্কিত যে পোশাক সেটা আমরা বাঙ্গালীরা কেন পরব? সে সময় থেকেই আমি আপনাদের তথাকথিত জাতীয় পোশাক পাঞ্জাবী নিজের পরিধানের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। আমি শার্ট প্যান্ট পরতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কারণ এটা আন্তর্জাতিকভাবে সকলেরই পছন্দ। আর তাছাড়া আমাদের পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মেয়ে শ্রমিকরা যে শার্ট বানায়, আশপাশের দেশ ঘুরে দেখে এসেছি সে সব জগতের সেরা শার্টের সাথে তুলনীয়।'

'পাঞ্জাবী না পরার যুক্তিটা কিন্তু অসাধারণ। শুনলেই এদেশের বুদ্ধিজীবীরা ক্ষেপে যাবে। এখন বুঝতে পারছি কেন আপনাকে কেউ অন্ধকারে ছুরি মেরে দেয়।'

হেসে একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল দিশা। কিন্তু মাশুক একটুও না হেসে বলল, 'সম্ভবত আপনার আন্দাজটা একেবারে অলীক নাও হতে পারে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আত্মগৌরবের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভবত অস্পষ্ট গোলযোগ আছে। যেমন বাঙালী জাতির জাতীয় পোশাকের নাম হলো– পাঞ্জাবী। আমি মুক্তিযোদ্ধা, আমি কেন শত্রু জাতির নাম অঙ্কিত পাঞ্জাবী পরে মাঠে ময়দানে, উৎসবে উৎরোলে গদগদ হয়ে ঘুরে বেড়াব?'

'চমৎকার যুক্তি সন্দেহ নেই। নিন এখন এক জোড়া আন্তর্জাতিক পোশাকই পরুন। আমার একটু চায়ের পিপাসা পেয়েছে। আমাকে কিচেনটা দেখিয়ে দিন আগে দু'কাপ চা করে আনি।'

হাসল দিশা। মাশুক বাহাত তুলে তাকে রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐদিকে যান। ওখানে চা, কফি, দুধ মজুদ পাবেন।'

দিশা কিচেনে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আগে বরং রিক্শাটা বিদেয় করে দিয়েই আসি। এখান থেকে গোছগাছ করে বেরুতে বেশ একটু সময় লেগে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। নিজের কামরাটাকে ত বই ছড়িয়ে একেবারে চষা জমির মতো করে রেখেছেন। আপনারা মানে কবি সাহিত্যিকরা পরিপাটি শব্দটা সম্ভবত নিজের পংক্তি রচনার সময়ই বেশী চিন্তা করেন। ব্যক্তি জীবনে বুঝি পরিপাটি কিছু থাকতে নেই?'

'এর জবাব দেব, আগে রিকশাটা বিদেয় করে আসুন। আপনার পকেট থেকেও ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারেন। এতোক্ষণ জানেন তো প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে তেমন টাকা-পয়সা ছিলো না। এখন অবশ্য আপনার ঋণগুলো শোধ করে দিতে পারি। ঐ বিছানাটা উল্টান, দেখুন গত মাসের পুরো বেতনটাই ওখানেই আছে। ইচ্ছে করলে গত দু'দিনে আমার জন্য যা খরচান্ত হয়েছেন তা নির্দ্বিধায় তুলে নিতে পারেন।'

খাটের শিথানের দিকটার দিকে ইঙ্গিত করল মাশুক।

দিশা এগিয়ে গিয়ে তোষকটা উল্টে দেখল দশ টাকার নতুন নোটের দুটো বান্ডিল সেখানে রাখা আছে। পাশে অনেক খুচরো টাকার নোট ছড়িয়ে।

'টাকাটা কি আপনার হাতে দেব? আমার ঋণটা না হয় পরে মনে করে শোধ করে দেবেন।'

এগিয়ে এসে টাকার বান্ডিল দুটো মাশুকের হাতে তুলে দিয়ে দিশা নীচে নেমে গেল রিকশা ভাড়া মেটাতে।

একটি অপরিচিত মেয়ের এমন সপ্রতিভ চলাফেরা, এমন নির্দোষ পরিহাসচঞ্চল কথাবার্তা ও মাশুকের মতো অসহায়ের প্রতি অনুগ্রহ মাশুককে খুবই ভাবিয়ে তুলল। মেয়েটা যা করছে তার সবটুকু কি অকপট? দিশারী বিবাহিত নয়। একজন পছন্দমত পুরুষের সন্ধান পাওয়া নিশ্চয়ই সে মনে মনে কামনা করে। মাশুকের মধ্যে সেকি সেরকম একজনকে পেয়েছে বলে মনে করে? একারণেই কি মাশুককে তাদের বাসায় নিতে যেতে এতো আগ্রহ? এ ধরনের

সন্দেহপ্রবণতায় মাশুকের নিজেরই খুব সংকোচ লাগে। মানুষ এমনিতেই এদেশে মানুষের উদারতা, মায়া-মমতা ও মানবতায় বিশ্বাসী নয়। মাশুকও মুখে যতোই মানবতাবাদের জয়গান করুক। এসব যে পেশাগত সাংবাদিক কিংবা সাহিত্যিক ভন্ডামি তা সে নিজের ব্যাপারে নিজেই উপলব্ধি করে। আবার একথাও ভাবে আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামের লৌকিক সমাজে এখনো মানবিক সরলতার সবটুকুই ভেঙে পড়ে যায়নি। দিশার মধ্যে কোথায় যেন একটা সেইরূপ লৌকিক আয়োজন জমা হয়ে আছে। দিশা এগিয়ে আসতে পারে কারণ সে এক অবিবাহিত শিক্ষিত নারী। তাছাড়া নিজের ছোটো বোন দিশার জন্য অপেক্ষা করেনি। এ ধরনের একটা ব্যাকুলতা থাকতে পারে দিশার মধ্যে। থাকলে কোনো দোষ নেই। দোষ হলো মানুষের চিন্তায় এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়। সেদিন যদি দিশা না হয়ে অন্য কেউ হতো মাশুক উত্তমরূপেই জানে সে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ঐ মুহূর্তে সহজে কারো সাহায্য পেতো কিনা সন্দেহ। দিশার আগমন অনেকটাই দৈব ঘটনার মতো হলেও এর অনিবার্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগছে না মাশুকের মনে। আশ্চর্য, কেন জাগছে না? দিশা সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া বলে কি? নাকি আহত কবির সামনে নিয়তি নিয়ে এসেছে এমন এক নারীকে যে কবিতারই অনুরাগী? মাশুকের কবি জীবনে প্রকৃতপক্ষে বহু নারীর স্নেহ ভালোবাসা সে পেয়ে চলেছে। এদের কেউ আত্মীয় কেউ আবার লেখালেখির সূত্রে পরিচিত। কেউ শুধুই ভক্ত। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে দিশা এদের চেয়ে আলাদা। দিশা সুশ্রী, অকপট এবং দয়ালু। লুব্ধ করার মতো শরীর স্বাস্থ্য দিশার আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একবারো মাশুকের মনে হয়নি দিশার যৌবনকে দিশা অসচেতন থাকার তিল মাত্র সুযোগ দিয়েছে। মাশুক দেখেছে মেয়েরা অনেক সময় শতো চেষ্টা করেও তাদের প্রদর্শনের নেশা বা ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে না। সচেতনভাবে বুকের ওপর থেকে শাড়ীর আক্র পড়ে যাওয়ার ছল করে ফেলে দিয়ে টানে। দিশা এখন পর্যন্ত তেমন কিছু ফেলেওনি টানেওনি। দিশাকে মাশুক যতোদিক থেকে বিবেচনায় আনছে ততোই সে আন্দাজের বাইরে চলে যাচ্ছে। মাশুক কেন যেন দিশারীকে অতোটা আন্দাজের বাইরে বিবেচনা করতে পারছে না, করতে ভয় লাগছে। এ ভয়টা তো আর ছুরি খাওয়ার ভয়ের মতো নয়। মাশুকের ভয় সে দিশারীর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। আর ভীতির উল্টো পিঠে আছে দিশারীর প্রত্যাখ্যানের ভয়। এখন পর্যন্ত দিশা যতো কিছু করেছে এতে বলা যায় না সে মাশুকের প্রতি আকৃষ্ট। তবে সে যে মাশুকের কবিতাকে ভালোবাসে এ ব্যাপারে তার কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই। মাশুক একজন সক্ষম সুন্দর পুরুষ। সে ভালোই রোজগার করে, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আকর্ষণীয়, এসব ভেবে দিশা এগোচ্ছে বলে মনে হয় না। একজন দুর্ঘটনায় আহত

কবির সাথে পরিচয় হলে জানলাম এর কবিতা ইতিপূর্বে আমাকে দারুণ উৎফুল্ল ও আন্দোলিত করতো। এখন দৈব পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে জানতে চাই কবিরা অর্থাৎ সৃজনশীল স্বপ্নতাড়িত মানুষেরা কেমন? দিশার উদ্দেশ্যটা মনে হয় এরকম। এরকম যদি হয়ে থাকে তবে মাশুকের দুঃখের এবং অনুতাপের সীমা থাকবে না। মাশুকের কবিতার চেয়ে মাশুক দিশার কাছে বেশী নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে চায়। ভাবলো মাশুক।

রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এসে দিশা বলল, 'আর সামান্য অপেক্ষা করুন চা করে আনছি।'

এর একটু পরেই দিশা চায়ের দুটো কাপের একটার গায়ের আংটায় মাশুককে ধরিয়ে দিয়ে মোড়া টেনে তার পাশে নিজের কাপ নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'বিয়ে করেননি কেন? সাধ জাগেনি বুঝি?'

'সাধ আর সাধ্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বলে।'

'আসল কথা হল, কবিতায় গল্পে আপনারা মেয়েদের যতো স্তুতি করেন। এর সবটুকুই যৌন আকাংখার ফেনা। ভাষা-সাহিত্য হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু প্রকৃত প্রিয়তমার প্রতি দরদ থাকলে কাউকে না কাউকে তো বলতে হয়, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি মানেই হল আমার প্রেম তোমার দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মতো সবল এবং সাবালক। একথা বোধ হয় এখনো কাউকে বলেননি?'

'বলার মানুষ লাগে না বুঝি?'

মাশুকের জবাব শুনে দিশা চা ছলকে হেসে ফেলল।

মাশুকও হাসলো তবে বোকার মতো।

দিশা বলল; 'এটা বলবেন না যে মানুষ মেলেনি। আপনার কবিতায় নারীরূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কারো সাথে সাক্ষাত না ঘটলে লেখা যায় না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমার মা-খালারাও তো নারী। আর আপনাকে হলপ করে বলতে পরি তারা উভয়েই ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। নারীর রূপ বর্ণনা করতে গেলে সব সময়ই যে প্রিয়তমা সুন্দরীতমাদের কাছেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'লিখেছেন তাদেরই উদ্দেশে-'

'তাদের উদ্দেশে কিন্তু তাদের নিয়ে নয়। সুনির্দিষ্ট কাউকেই নিয়ে নয়। বিশ্বাস করুন তেমন সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি।'

মাশুকের কথায় দিশা মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল। একটু লজ্জামিশ্রিত আবিষ্কারের আনন্দে হিল্লোলিত। মাশুক চা শেষ করে নিজেই স্যুটকেস নামিয়ে এনে বিছানায় রাখল। আমার শার্ট প্যান্টগুলো এর মধ্যে ভাঁজ করে নিয়ে নিন। সত্য কথা বলতে কি দিশা, আমার এখনো ভয়টা যায়নি। আচ্ছা বলুন তো কে আমাকে মেরে ফেলতে চায়? কে আমার কবিতার এমন শত্রু যে সামান্য কবিতার জন্য আমার জীবনকে পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করে? আমি খুব ভয় পাচ্ছি দিশা। আমার মনে হয় আমার হত্যাকারীদের কোনো একটা পরিকল্পনা থাকলেও থাকতে পারে। শুধু শুধু তো আর একটা মানুষকে কেউ ছুরি মেরে দেয় না? আমাকে জানতে হবে কবিতা বিরোধী সেই পরিকল্পনাটা কি? তার আগে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ বেঁচে থাকতে হবে বৈকি। তবে বেঁচে থাকতে হবে কবিতাকে নিয়েই।'

'কবিতা আর লিখতে চাই না দিশা। আমার রচনাই যখন অন্যকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে তখন কবিতা দিয়ে আর কি হবে? আমি আমার জীবনের চেয়ে কবিতাকে বড় মনে করি না।'

'কিন্তু যারা আপনাকে হত্যা করতে চায় তারা আসলে আপনার কবিতা লেখাটাই স্তব্ধ করতে চায়। না লেখাটা হবে আপনার পরাজয় কবি সাহেব। আমি বলি কি, অসুস্থ এবং আহত অবস্থা নিয়েও আপনাকে কাব্য রচনায় বিরতি দেয়া উচিত হবে না।'

হাসল দিশা।

দিশার কথায় অনেকটা ধৈর্যহীনের মতো মাশুক তার ঘরের ছাদের দিকে তাকাল।

'কি নিয়ে লিখব? বলুন কাকে নিয়ে লিখব?'

এবার দিশা হেসে এগিয়ে এসে মাশুকের পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল।

'কেন আগে যেসব বিষয় নিয়ে লিখতেন। যেমন প্রেমপ্রীতি, দেশ। এই মহানগরীর জীবনযাপন। এসব নিয়েই তো আপনি মূলত এতোকাল লিখেছেন। কি চমৎকার সব উপমা আর প্রতিতুলনা আপনার। আপনার সাথে পরিচয় না থাকলেই মনে হয় ভালো ছিল। তখন ভাবতাম আপনি স্বপ্নের ঘোড়ায় সোয়ার কোনো ফেরস্তা বিশেষ।'

'তাই নাকি? এখন, অর্থাৎ পরিচয়ের পর কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে বুঝি আমি এক নিঃস্বপ্ন নিষ্ফল মানুষ। যে কিনা ঘাতকের ছুরির নীচে খরগোশের

বাচ্চার মতো কম্পমান?'

'না। তা কেন ভাববো? তবে আপনি খুব ভয় পেয়েছেন, এটাতো সত্য?'

'ভয় কবিতার শত্রু। ত্রস্ত ব্যক্তি কেবল পালায়। আমিও পালাচ্ছি। কেউ ছুরি মেরে দেবে এই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি আপনার মতো এক মহিলার আশ্রয়ে। ভীত প্রাণ কাব্য সৃষ্টি করতে পারে না দিশা, এটাই সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রধান শর্ত।'

'এ শর্ত আপনি মানবেন কেন? যখন নিজেই সব বুঝতেও পারছেন। আর আমি মহিলা বটে তবে অবলা নই। আমি আমার নিজের সাহসের বলেই আপনাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাচ্ছি। এতে কে কি ভাববে কিংবা আপনি কি ভাবছেন এর তোয়াক্কা করি না। আর একটা কথা, জানি না আমি ঠিক বলছি কিনা, আপনি যতোটা না আততায়ীর ভয়ে ভীত। তার চেয়ে একাকীত্বের ভয়টাই এই মুহূর্তে আপনার অনেক বেশী। আশ্চর্য আপনার মতো স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি এমন নিঃসঙ্গ? আমার ধারণা একাকীত্বই আপনাকে লিখতে বারণ করছে। আমি কিন্তু আপনাকে সঙ্গ দিতে চাই আমাকে নিয়ে কিছু লিখবেন বলে।'

'আপনাকে নিয়ে?'

'কেন আমার মধ্যে কাব্য করার মতো কিছুই দেখছেন না বুঝি?'

'একটা জিনিস তো স্পষ্টই দেখছি। দেখছি ঠিক নয়, উপলব্ধি করছি, আপনি দারুণ সাহসী মেয়ে।'

'তাহলে না হয় আমার সাহস নিয়েই কিছু লিখবেন যখন অন্যকিছুই আপনার নজরে পড়ছে না।'

বলেই দিশা জোরে হেসে ফেলল।

দিশার হাসিতে বিব্রত মাশুক এতোটুকু হয়ে মাটির দিকে চেয়ে থাকল। দিশা আর কথা না বাড়িয়ে মাশুকের জামা-কাপড় আলমারী থেকে তুলে এনে বিছানায় রাখল।

রাতের খাওয়ার টেবিলে নিশানা মাশুককে লক্ষ্য করে বলল, 'দেখুন কবি ভাই আমরা একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। সবাই চাকুরি-বাকুরি করে খাই। আপনি তো ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আমার বোনের কাছে আমার আর আমার স্বামীর পেশা সম্বন্ধে জেনেছেন। আমাদের কারোরই সারাদিন ঘরে থাকার উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে আপনার সেবাযত্ন করার ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা ঠিক মতো

পারবো বলে ভাবি না। তবুও অকপটে বলছি, আপনার এ বাড়িতে আসার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি ও আমার স্বামী ভাবতেও পারি না আপনাদের মতো একজন নামী সাহিত্যিক আমাদের অতিথি। আমাদের একটাই অনুরোধ, সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।'

একটা প্লেট সামনে টেনে এনে মাশুক জবাব দিল 'দেখুন, মিসেস নিশা আমি আপনার বোনের অমায়িক এবং সাহসী ব্যবহার আর আপনাদের কাছে একটু মানবিক সাহায্যের আশায় এখানে এসেছি। আপনার বোনের ধারণা পুনর্বার ছুরির ভয়ের চেয়ে আমার নৈসঙ্গ্যও নাকি এখন আমার কাছে ভয়াবহ। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এক সময় আমি একা থাকতে চাইতাম। জানেন তো কবিদের সৃষ্টির মুহূর্তে একটু একাকীত্ব দরকার। এখন আপনাদের সান্নিধ্যে এসে মনে হচ্ছে আমি চিরকালই নিঃসঙ্গ ছিলাম বলে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গসুখ কাকে বলে তা জানতেই পারিনি। আমি আপনারা দু'জন এবং দিশার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।'

খুব বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাশুক।

নিশা তার পাতে ভাত তুলে দিতে দিতে হাসল, 'আমাদের কাছে ওসব বলবেন না। আমার বোন, সম্ভবত এতোক্ষণে আপনার জানা হয়ে গেছে, আপনার কবিতার ভক্ত। আমি অবশ্য কবিতা বুঝি না। ব্যাংকে টাকা-পয়সার হিসেব রেখেই গলদঘর্ম। তবুও এটা জানি আপনি অনেক বড়ো কবি। আপনাকে কেউ ছুরি মারতে পারে এটা আমাদের কাছে খুবই অবিশ্বাস্য। আপার কাছে জানলাম, আপনার কাব্যের জন্যই শত্রুরা আপনাকে মেরে ফেলতে চায়। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এখানে আপনি নিরাপদ। কিছুদিন এখানে থেকেই লিখুন না। এখন থেকে আপার মতোই আপনার কবিতা পড়ব। যে কবিতা কবির মৃত্যুকে ডেকে আনে তা কি মানুষ না পড়ে পারে? যতো দিন এ বাসায় থাকবেন প্রতিদিন একটা করে লিখে যান। শেষ হলেই আমাদের পড়ে শোনাবেন। আমরা শুনব।'

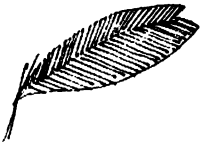

প্রথম কয়েকদিন অস্বস্তিতে কাটলেও পড়ে এই ক্ষুদ্র পরিবারটিকে মাশুকের বেশ অমায়িকই মনে হল। দিশা তো তার কলেজের পর বাকী সময়টা মাশুককে তার মানসিক ভয়ভীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টার কোনো ত্রুটিই রাখল না। নিশানা আর তার স্বামী উভয়েই অনেকটা গায়ে পড়ে মাশুকের আবৃত্তির ক্যাসেট বাজার থেকে কিনে এনে অফিস ফেরতা বাড়িটাকে গরম করে রাখল। মাশুক অবশ্য অতিশয় বিবেকবান মানুষ। সহজেই বুঝে ফেলল তাকে এরা এটা বুঝতে দিতে চায় না যে সে এ বাড়িতে অনাহূত আগন্তুক। একটা আপদ বিশেষ। এদিকে এদের আপ্যায়নের বাড়াবাড়িতে ক্রমাগত মাশুক সংকোচিত হয়ে থাকল। মাশুক এখনো বুঝতে পারছে না। কারা তাকে মেরে ফেলতে চায়? কেন মেরে ফেলতে চায়? মাশুক তার কবিতায় প্রকৃত পক্ষে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেছে বলে মনে পড়ে না। তবে একথা অবশ্য বলা যাবে না সাহিত্য ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কিংবা তার কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। মাশুক এমনিতে ধর্মপ্রাণ এবং সৌন্দর্যবাদী। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির উৎসমূল যে মহান আল্লাহ তা মাশুক গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস থেকেই মাশুক তার কবিতায় উপমা বয়ন করে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই প্রায় নাস্তিক। তারা জগৎসৃষ্টির কার্যকারণ নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা কেবল মানব সমাজের মধ্যে সাম্য স্থাপনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের প্রবক্তা। তাদের পথ হিংসাত্মক। তারা মানব সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণীর উচ্ছেদের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। এ ধরনের সমাজ বা রাষ্ট্রের পতন সোভিয়েত রাশিয়ার আশু উচ্ছেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেও এদেশে তারা ক্ষান্ত হতে চায় না। এজন্যই কি প্রকৃত কবিকে তারা শত্রু না ভেবে পারে না? এ জন্যই কি মাশুকের ওপর এই আক্রমণ?

মাশুক এখনো কিছু ভেবে স্থির করতে পারে না। সে দিশাদের তিনতলা ফ্লাটের জানালা সংলগ্ন একটি বারান্দায় বসে দিশার অপেক্ষা করছিল। এখন একটা বাজে। এ সময় দিশা কলেজ থেকে ফিরে এসে মাশুক এবং নিশার স্বামীকে খেতে দেয়। খেয়েই আকরাম অর্থাৎ নিশার স্বামী অফিসে ফিরে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় নিশার লাঞ্চ। আর দিশা খাওয়ার পর মাশুকের সাথে গল্প করে।

পরে মেহমানকে দিবানিদ্রার পরামর্শ দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখে।

আজো এর ব্যতিক্রম ঘটল না। দিশা যথা সময়েই ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই দিশা মাশুককে বলল, 'খাবার দিচ্ছি টেবিলে আসুন।'

মাশুক বলল, 'আকরাম সাহেবের জন্য অপেক্ষা করলে হয় না?'

'আপনি এসে বসে যান। আকরাম আজ আসবে না। টেলিফোনে জানিয়েছে। ওরা আজ বাইরে খাবে।'

'মাঝে মধ্যে বাইরেই লাঞ্চ সারে বুঝি?'

'না। আমিই ওদের বলেছি বাইরে খেতে। আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। ওরা থাকলে আমি কথাগুলো বলতে পারব না।'

মাথা নুইয়ে কথা বলছে দিশা।

মাশুক ইজিচেয়ার থেকে সোজা হয়ে বসল।

'আমার সাথে কথা? আমি জানি অনাত্মীয় একজন উটকো লোককে আশ্রয় দিয়ে আপনাদের অসুবিধের শেষ নেই।'

'অসুবিধে একটু হচ্ছে বৈকি। তবে আপনি তো আর ইচ্ছে করে আমাদের বাসায় আসেন নি। বরং আমিই গায়ে পড়ে আপনাকে এখানে নিয়ে আসি। আমি অন্য একটা বিষয়ে আপনার সাথে একটু নিভৃতে কথা বলতে চাই কবি সাহেব। আপনি কেন অযথা একথা ভাবছেন আপনার মেহমানদারীতে আমি আর আমার বোন অস্বস্তিবোধ করছি। আমি খাবার লাগাই। আগে খেয়ে নিন আলাপ করব।'

বলে দিশা ভেতরে চলে গেল। মাশুক বুঝতে পারল না দিশা তাকে কি বলতে চায়? কি এমন কথা যাতে ছোটো বোন এবং ভগ্নিপতির উপস্থিতিও গ্রাহ্য নয়?

বেশ একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে মাশুক আকাশের দিকে মুখ তুলল। শীতের আমেজ এখনো ফুরোয়নি। আকাশে দু'এক খণ্ড পুঞ্জীভূত মেঘের টিলা জমেছে। হাতমুখ ধোয়ার জন্য মাশুক টয়লেটে গিয়ে ঢুকল। বেরিয়ে এসে দেখে টেবিলে ইতিমধ্যেই ভাত তরকারি সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য দিনের মতো দিশা দাঁড়িয়ে নেই।

মাশুক এসে টেবিলে বসে পাতে ভাত নিয়ে দিশার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাথরুম থেকে ঝরণা ছেড়ে দিয়ে কারো গোছলের শব্দ পেল মাশুক। দিশা

বোধহয় আজ কলেজ যাওয়ার সময় নাইতে পারেনি। মাশুক ভাবল দিশা না বেরুনো পর্যন্ত একটু বরং অপেক্ষাই করা যাক। কি বলবে দিশা? বরং মাশুকেরই তো দিশাকে কিছু বলা উচিত। বলা উচিত একটি আপতিক ঘটনায় জড়িয়ে গিয়ে তার মতো একজন ভদ্রমহিলার কতোই না হেনস্থা হল? এখন দিশা যদি অনুমতি দেয় তবে সে তার ইস্কাটনের আস্তানায় ফিরে যেতে পারে। দিশার কাছে সে ঋণী। দিশা তাকে হাসপাতাল থেকে এ পর্যন্ত যা করেছে তা অনাত্মীয় অপরিচিত কেউ কারো জন্যে করে না। এ ঋণ অপরিশোধ্য। এবার সে ঝামেলার হাত থেকে এ সুন্দর পরিবারটিকে মুক্তি দিতে চায়। তাছাড়া তারও তো খানিকটা কাজকর্ম করে খেতে হয়। দুসপ্তাহ হয়ে গেল সে যে পাক্ষিকে কাজ করে সেখানে হাজিরা দিতে পারেনি। দুর্ঘটনার দু'দিন পর শুধু দিশার মারফত একটা ছুটির আবেদন পাঠিয়ে জানিয়েছিল, তার দুর্বলতা এখনো কাটেনি। অন্তত দু'সপ্তাহের কমে তার পক্ষে কাজে যোগ দেয়া সম্ভব নয়। তার ওপর হামলার খবর যেহেতু এদেশের সবগুলো প্রধান দৈনিকেই ছাপা হয়েছিল সেহেতু কর্তৃপক্ষ দিশার মারফত জানিয়ে দিয়েছিল তাকে দু'সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। তবে সুস্থ হয়েই যেন সে কাজে ফিরে আসে। তার জন্য পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি অগত্যা স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর কি?

পক্ষকাল পার হওয়ার আর মাত্র একটা দিন বাকী। দিশা কি তার ছুটি ফুরিয়ে গেছে এবং তার এখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্নিকট বলেই কিছু বলতে চায়? দিশা জানে তার সান্নিধ্যর্ত্ত সাহস পেয়ে মাশুকের ছুরির ভয় অর্থাৎ অদৃশ্য আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়টা অনেক কমে গেছে। সে এখন দিশার সাথে প্রায়ই বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরোয়। যে সব রাস্তায় লোক চলাচল কম কিংবা পার্ক এলাকার সবুজ ফাঁকা মাঠ যেখানে আছে। আজকাল দিশা তাকে নির্ভয়ে হাত ধরে টেনে সেখানে নিয়ে যায়। পার্কে বসে বলে আজ জীবনানন্দ আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। ঐ যে লাইনগুলো, 'কালরাতে ফালগুণের রাতের আঁধারে —।'

যদিও আততায়ীর ভয়টা এখনো মাশুককে একদম ছেড়ে যায়নি তবুও দিশা তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে শত্রুর অস্তিত্ব, অবস্থিতি বা নাম সম্বন্ধে মাশুকের কোনো ধারণাই নেই সে কারণেই আতংকের মধ্যে দিন কাটানোটা মাশুকের পক্ষে ছায়ার সাথে কুস্তিলড়ার সামিল মাত্র। মাশুককে কবি হিসেবে ভাবতে হবে এ জগতে তার কোনো শত্রু নেই। যেমন এখন এবং কিছুদিন আগে সে ভাবত তার কোন আত্মীয় বা স্বজন নেই। তবু দৈবভাবে দিশা এবং তার

পরিবারের সদস্যরা কিভাবে তার পাশে দাঁড়াল? দিশা মাশুককে সারা সময়ই এ ধারণা দিতে চাইছে যে, এটা হল মাশুকের ঈমান বা বিশ্বাসেরই পুরস্কার এতে দিশার কোন হাত বা মতলব নেই। মাশুক যতোই ভাবুক না কেন, দুনিয়ায় তার আপনজন কেউ নেই। প্রকৃতপক্ষে মাশুক যে সমাজে বাস করে সেটা মানুষেরই সমাজ এবং মানুষ মানুষেরই সুখদুঃখে লিপ্ত হতে ভালোবাসে।

বেশ কিছুক্ষণ মাশুক প্লেটের ওপর হাত তুলে এসব চিন্তা করল। এর মধ্যে কখন যে দিশা গোসল সেরে ভেজা চুলে টাউয়েল পেঁচিয়ে তার বিপরীত দিকের আসনে বসে নিজের প্লেট টেনে নিয়ে তার চিন্তিত মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তা খেয়াল করতে পারেনি। এখন তার ধ্যান ছুটে গেছে টের পেয়ে দিশা হাসল।

'কি এতো ভাবছেন?'

'কাল আপনাদের কাছে বিদায় নিতে চাই ম্যাডাম। অনেক তো ভোগালাম।'

'এতে এমন চিন্তিত হওয়ার কি আছে? যদি ভাবেন মনে যে মারাত্মক ভীতিটা ছিল সে মূলত অলীক কল্পনা মাত্র তবে তো নিজের কাজকর্মে ফিরে যেতে চাইবেনই। আপনার পাতে মাছের ভাজিটা দিই?'

শিং মাছের দোপেয়াজা পুরোটাই দিশা ঢেলে দিল মাশুকের পাতে। দিশা এই কয়েকদিনে খাওয়াতে গিয়ে লক্ষ্য করেছে মাশুক এ আইটেমটা খুব পছন্দ করে। মাশুক দিশার পরিবেশনের কায়দাটা দেখে কিছুক্ষণ পাতের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। তারপর দেখল দিশা চুপচাপ নিরামিষ দিতে ভাত মাখিয়ে লোকমা তুলছে। সদ্য গোসল দিয়ে আসায় তার মুখমন্ডল এবং বাহুলতায় একটা অতিশয় তাজা পরিচ্ছন্নতা কিংবা একটু বাড়িয়ে বললে বলা যায় পবিত্রতা চকচক করছে। ভেজা চুল টাউয়েলে মুড়িয়ে খোঁপা বাঁধায় এক বিশাল ফুলের তোড়ার মতো লাগছে। এখন দিশা সাধারণ তাঁতের শাদা শাড়ি পড়েছে। গলায় নিত্য যে গয়নার চিহ্নের মতো মাত্র একটা সরু সোনার হার থাকে সেটাও নেই। কণ্ঠা শূন্য থাকায় গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতা এমনভাবে প্রকটিত হচ্ছে যে মাশুক বাধ্য হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

'আপনার সব ব্যাপারেই একটা পরিমিতিবোধ আমি এতোদিন আপনাদের সান্নিধ্যে থেকে লক্ষ্য করেছি। শুধু লক্ষ্য করেছি বললে কথাটা আমার মতো কবির মুখে একটু অলংকারহীন শাদা-মাটা শোনায়। বলা উচিত উপভোগ করেছি। কিন্তু আপনার পরিবেশনটা একটু বন্য প্রকৃতির। আমাকে পুরো মাছের ভাজিটা পাতে

সহসা ঢেলে দিয়ে আপনি নিরামিষ দিয়ে ভাত মাখাচ্ছেন? যাহোক, আমাকে কিছু বলবেন বলে আপনার বোন আর ভগ্নিপতিকে আজ বাইরে খেতে বলেছেন। এখন বলুন, ঔৎসুক্য আর ধরে রাখতে পারছি না?'

যতোটা সম্ভব গুছিয়ে কথাগুলো বলে মাশুক দিশার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে মুখ তুলল।

দিশা তখনো মাথা নুইয়ে পাতের ভেতর আঙুল দিয়ে ভাত গোণার মতো খেলছে। সহসা কোনো জবাব না দিয়ে আরো একটা লোকমা তুলল মুখে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দু'জনেই মনযোগ দিয়ে খাচ্ছে এমন ভান করে গেল। মাশুক বুঝল দিশা যা বলতে চায় তা বলার মতো সাহস সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিজেই শেষে কবিসুলভ হাসিমুখ করে বলল, 'আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে মিস দিশা?'

'আপনার পক্ষ থেকে কোন অপরাধ হয়েছে এ কথা আমি কেন বলতে যাব কবি? বরং আমাদের দেশের কবিদের সম্বন্ধে যে সব গাল-গল্প শুনি আপনার মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই দেখে আমি আর আমার বোন বরং হাসাহাসিই করি। আপনি শুধু প্রিয় লেখকই নন। মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত চরিত্রবান মানুষ। আমার বক্তব্য আপনার নিজের কোনো কল্পিত অপরাধের জন্যে নয়। আমার বলার বিষয় আমারই নিজের অপরাধবোধ সম্বন্ধে।'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। আমাকে যখন কিছু বলতেই চান একটু খুলে বলুন ম্যাডাম?'

বেশ আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল মাশুক।

দিশা হাসল।

'একটু আগেই আপনি বলছিলেন আমার অনেক অভ্যেস-আচরণ আমাদের সান্নিধ্যে থেকে আপনি উপভোগ করেন।'

'মিথ্যে বলিনি।'

'আমিও কবি সাহেব কয়েকটা সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে অপরাধী করে ফেলেছি। সত্যকথা বলতে কি আমিও আপনার অনেক অভ্যেস-আচরণ, পৌরুষের সৌন্দর্য, প্রতিভা ইত্যাদিতে উপভোগের আনন্দ পাচ্ছি। আমি মনে করি এটাও আমার মতো একজন মসলিম যুবতীর জন্য গোপন উপভোগ। আপনার অজান্তে আপনার এবং আমার উভয়েরই আত্মার ক্ষতি সাধন করা। আপনি আমার কেউ নন। আপনার ওপর ঘটে যাওয়া ঘটনাটির এক মুহূর্ত আগেও আমার মনে

কোনো পুরুষের ছায়াপাত ছিল না। আমি মনে ও দেহে ছিলাম পবিত্র। কিন্তু ঐ যে বললেন আমার চাল-চলনের একটা উপভোগ্যতা আছে! সেটা আপনার আচরণে আমার মধ্যেও সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। যা আপনার অজানা থাকলেও আমার তো অজানা নয়। আমি এর থেকে এই মুহূর্তে মুক্ত হতে চাই। আশাকরি আপনি আমার দোষ নেবেন না। একদা আমি ভাবতাম নর-নারীর উদার মেলামেশার যারা সমালোচক তারা হীনমন্য। এখন আমি একথা আর ভাবতে পারছি না। আপনার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে আমার অন্তরের আয়নাটা ছিল শূন্য। সেখানে একটা আকাংখার ছায়াপাত থাকলেও তা ছিল বিমূর্ত। এখন আয়নাটা আমি যতোই ঘোরাই-ফেরাই সেখানে আমার অজান্তে আমার আকাংখাসমূহ একজন পুরুষের চেহারা হয়ে যাচ্ছে। যে পুরুষের সাথে আমার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে দৈবাৎ। আমি চাইনি, আদৌ চাইতাম কিনা তাও জানি না। কাল আপনি আপনার বাসায় চলে যাবেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আপনার নাগরিক দায়দায়িত্বে মিশে যাবেন। আমার মতো সামান্য একজন কলেজশিক্ষয়িত্রীর সাথে দৈব দুর্ঘটনায় পরিচিত হওয়ার কথা মনে থাকলেও এর গুরুত্ব আপনার কাছে আর কতোটুকু? কিন্তু আমার মানসজগৎ থেকে আপনার মুখ আমি আর ফেরাতে পারব না। পরে আমি যার সাথেই ঘর বাঁধিনা কেন সেখানে আমার স্বামীর মুখখানি আর আঁটাতে পারবো না। এখন আমি বুঝতে পারছি নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাটা কেন? এর মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ধর্তব্যের মনে আনি না বলেই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েকটা দিন আমার মধ্যে এমন এক মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে কবি, যার গুরুভার আমি আর বইতে পারছি না। আমার এর থেকে রেহাই পেতে হলে এ কথাগুলো লজ্জা-শরম ত্যাগ করে আপনার কাছে বলার একান্ত দরকার ছিল বলেই আজ আপনার সাথে খোলামেলা আলাপের একটা অবকাশ খুঁজেছিলাম।'

দিশার কথায় একটু ছেদ পড়ায় পূর্ণ দৃষ্টিতে মাশুকের দিশার দিকে তাকাবার সামান্য ফুরসৎ হল।

'আমি জানি আপনি আমাকে সরাসরি চলে যেতে বলছেন। আমিও চলে যেতেই চেয়েছিলাম। আমিই একথা আপনাকে আজ বলতাম। কিন্তু একটা কথা আমি একটু বুঝতে চাই। আমার আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় থেকে আপনি এ পর্যন্ত আমার জন্য যা কিছু করেছেন এটা কি ধর্ম বা নৈতিকতার দৃষ্টিতে আপনি দিশারী মালিক, সিদ্ধেশ্বরী কলেজের লেকচারার, অপরাধ ঠাউরেছেন?'

'না, তা কেন ভাবব? আপনি বিপদগ্রস্ত ও রক্তাপ্লুত ছিলেন। আমি সেখানে না এসে যদি অন্য কেউ আসত তবে তিনি যা করতেন আমিও সেটাই করেছি। এটা মানবিক কর্তব্যবোধের যুক্তি হলেও ধর্মীয় কর্তব্যের যুক্তি এর থেকে মোটেই আলাদা নয়। আলাদা হল আমার ঘনিষ্ঠ হওয়া ও মানসিক উপভোগের সুপ্ত বাসনার মধ্যে। আমার বাসনার সাথে আপনার বাসনার কোনো যোগসূত্র আছে বলে আমি ধরে নিয়েছি, এমন নিম্ন রুচির মানুষ হিসেবে আমাকে বিবেচনা করবেন না দয়া করে। আমি একথা বলছি না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি আপনার ওপর আপতিক দুর্ঘটনার সেবার চেয়ে আমার মন একটু অধিক আকাংখার গোনায় লিপ্ত, এ প্রমাণ আমি স্বয়ং আবিষ্কার করে নিজেই ভীত হয়ে পড়েছি কবি। আমাকে ক্ষমা করুন এবং আর বিলম্ব না করে আমাদের বাসা থেকে চলে যান। আমি যেমন আপনাকে বিপদে সাহায্য করেছি। তেমনি আপনার কাছে আমার অন্তরদ্বন্দ্বে একটু কি সহানুভূতি পেতে পারি না?'

কাতর মিনতির মতো ফুঁপিয়ে উঠল দিশা।

মাশুক উঠে বেসিনের কলের নীচে হাত ধুতে দাঁড়াল। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার আত্মবিশ্বাসকে মোচড়াতে লাগল। দিশা যেমন সহজভাবে তার নারীসুলভ অসহায়তা এবং পবিত্রতার দ্বন্দ্ব অনায়াসে ব্যক্ত করতে পারল। মাশুকের কি তা পারার সামান্যতম মুরদ আছে? সন্দেহ নেই মাশুক এখনো জানে না সে নিজেরই অজ্ঞাতে এই রোদনরত মহিলাটিকে ভালোবেসে ফেলেছে কি না। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে নারীর পবিত্রার এক ধরনের আলোকচ্ছটা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। দিশা একবারো বলেনি কবি তোমাকে আমি ভালোবাসি। বরং সোজাসুজি বলেছে তোমার পৌরুষহীন মুখ অন্যায়ভাবে আমার অন্তরআর্ণীতে প্রতিফলিত হওয়ার পাপ আমাকে ছুঁয়েছে। এর জন্য আমিই দায়ী। কারণ একটা দুর্ঘটনার অজুহাতে আমি তোমার সামনে আমাকে উন্মুক্ত করে ফেলেছি। এখন আমি আমার নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে ভয়ে কাঁপছি। এর থেকে রেহাই চায় দিশা। এটা ছাড়া দিশার মতো ভালো মেয়ে মাশুককে আর কিইবা বলতে পারে? মাশুক কেন ভাববে দিশা তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? বরং দিশা নিজের কালো প্রতিচ্ছায়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় মাত্র।

মাশুক নিজের কামরায় এসে স্যুটকেসটা টেনে বিছানায় নামাল। আলনার কাপড়চোপড় অর্থাৎ তার শার্ট প্যান্টগুলো এক এক করে তোলার সময় টের পেল পেছনে দিশা এসে দাঁড়িয়েছে।

'আপনি কি এখুনি চলে যাচ্ছেন? এই মাত্র খেলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে না হয় যাবেন। আমি ততোক্ষণে আপনার জিনিসপত্র স্যুটকেসে গুছিয়ে দিতে পারব। আর যাওয়ার আগে নিশাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলে আমার জন্য ভাল হয়। নইলে আমার বোন ভাববে আপনি বুঝি আমার ওপর রাগ করে চলে গেলেন।'

মাশুক ফিরে দেখল দিশা দাঁড়িয়ে নখ খুটছে। খোঁপায় বাঁধা তোয়ালেটা খুলে ফেলায় বিপুল কেশরাশি পিঠে ছড়ান। দিশার হৃদয় যে এই মুহূর্তে অন্তরদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তা মাশুকের বুঝতে বাকী রইল না। মাশুক বিছানার ওপর কাপড় জামাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসল। মাশুক তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে দিশা শাড়ির আঁচল টেনে এনে মাথা ঢেকে বলল, 'আপনার ঘাড়ের ক্ষতটা শুকিয়ে গেলেও দাগটা এখনো আছে। দাগটা মেলাবার জন্য একটা লোশন আছে। ডাক্তারের কাছে গেলেই লিখে দেবে। অবহেলা করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

গভীর আন্তরিকতা থাকলেও দিশা যে দূরত্ব তৈরি করে নিয়েছে মাশুক তা অনুভব করল। মাশুকের কি খেয়াল হল মাশুক বলল, 'দিশা, আমি যদি তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করি তুমি কি কিছু মনে করবে?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে দিশা একটু দিশেহারার মতোন মাশুকের মুখের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই তার মনে হল একটু আগে দিশা মাশুককে তার নারীসুলভ যে সমস্যার কথা অকপটে বলেছে মাশুক সেটাকে কবিদের স্বাধীনতার প্রচলিত যুক্তির দ্বারা সহজ করতে চাইছে না তো?

দিশা হাসল, 'আপনি যদি আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনই আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন তবে এখন আমাকে তুমি বললে আমার লজ্জা হতো না।

আমিতো বয়েসে আপনার ছোটোই হবো। আপনি তো আমার ছোটো বোনকেও আপনি বলে সম্বোধন করে এসেছেন। এখন হঠাৎ তুমি বললে একটু বেখপ্পা শোনাবে না? আর একজন সাবালক পেশাগতভাবে শিক্ষককে আপনি হঠাৎ আপনি থেকে তুমি বললে ভাবব আপনি প্রতারণা করছেন। আমি দৈবাৎ আপনার জন্য যে উপকারটুকু করতে বাধ্য হয়েছি এর কোনো প্রতিদানের দরকার নেই। আমি আপনার কবিতা পড়ে তা পুষিয়ে নেব। আপনি তো জানেন আপনি আমার প্রিয় লেখক, আপনি চান তো আমি আপনার এখান থেকে নিজের বাসায় চলে গেলেও অন্তত কিছুদিন খোঁজ খবর নেব। ভাববেন না আমি বা আমার পরিবার আপনাকে ভয়ের মধ্যে একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব। আপনার দেহমন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ আমি, নিশা, আকরাম সবাই আপনার খোঁজ নেব। আমার ধারণা আপনার ভয় কেটে গেছে। এবার বিশ্রাম নিন, সন্ধ্যেয়যাবেন।'

সন্ধ্যায় বিদায়ের সময় বাসার সবাই মাশুককে স্কুটারে তুলে দেয়ার জন্য নিচে নেমে এল। আকরাম বলল, 'বাসায় গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না। কাজের ফাঁকে অবসর পেলে গল্প করে যাবেন।'

আকরামের সাথে হাত মিলিয়ে স্যুটকেসহ মাশুক স্কুটারে উঠে বসল। নিশা মুখ বাড়িয়ে হাসল, 'আপাকে নিয়ে আপনার বাসায় বেড়াতে যাব।'

দিশা মুখে কিছুই বলল না। শুধু বোন আর ভগ্নিপতির পেছনে দাঁড়িয়ে নীরবে বিদায় জানাল। গাড়ির স্টার্ট উঠলে মাশুক হাসবার চেষ্টা করে দিশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খোদা হাফেজ।'

মাশুক বাসায় ফিরে ঘরের আগোছাল জিনিসপত্র মোটামুটি পরিপাটি করে নিয়ে শোয়ার খাটে পাতা বিছানার চাদর এবং বালিশের ঢাকনা পাল্টে নিল। কবিতার ডায়ারীটা বহুদিন অব্যবহৃত জিনিসের মতো স্যুটকেসে পড়েছিল। ডায়ারীটা শিথানে সাজিয়ে রেখে ভাবল পক্ষকাল কিছুই লেখা হয়নি। লেখার মতো একটা শব্দও কেন জানি মনে খেলছে না। তবুও মাশুক প্রতিজ্ঞা করল আজ রাতে সে অল্প কয়েক লাইনের হলেও একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করবে। ওবাসায় দিশার বোন নিশা বলত, 'কবিরা কিভাবে কবিতা লেখেন তা আমার দেখার খুব সখ ছিল। কিন্তু সখটা বোধ হয় এ যাত্রায় মিটল না।'

মাশুক জবাব দিয়েছিল, 'ত্রস্ত মস্তিষ্ক কল্পনা করে কিভাবে সে পালিয়ে বাঁচবে।'

'তাই বুঝি? আমাদের এখানে এ কয়দিনে এতোটাই হাঁপিয়ে উঠেছেন? আমি ভাবছিলাম আমাদের মতো ব্যাংকের কেরানীর দিকে চোখ তুলে তাকাবার ফুরসত না পেলেও, আমার বোনকে নিয়ে অন্তত একটা কবিতা লিখবেন।'

'আপনার বোনের যোগ্য উপমা হাতড়ে বেড়াচ্ছি।'

'এখনো পাননি বুঝি?'

' চেষ্টার তো কসুর করছি না। মনে হয় আপনার বোনের কোনো তুলনাই হয় না।'

এটাও সাধারণ মানুষের মতো কথা হল। কবির কথা নয়। কবিতো বলবে অসাধারণ কিছু কথা। বলবে, আহা তোমার মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদের মতো। কিংবা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা –।'

বলতে বলতে নিশা গড়িয়ে পড়েছিল হাসিতে।

মাশুক নিজেই অবশ্য রেঁধে খায়। আজ রাতে তা কিছুতেই সম্ভব নয় তেবে মাশুক নিচে গিয়ে একটা হোটেল থেকে খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল। শোয়ার সময় মাশুকের ধারণা ছিল সহজে ঘুম আসবে না। কিন্তু বালিশে মাথা রাখতেই শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক বিপর্যয়টা মাশুককে একটা স্বপ্নের শহরের সাধারণ অলিগলিতে নামিয়ে দিল। মাশুক দেখল সেখানে তার স্বপ্নের গৃহস্থালির পাহারা দিচ্ছে যে অংশীদার সে দিশার মতো হলেও দিশা নয়। মাশুক মোটেই অবাক হল না। কারণ স্বপ্নের মধ্যে কেউ অবাক হয় না। তবে পরিচিত কিন্তু এই মুহূর্তে নাম মনে পড়ছে না– এ ধরনের ক্ষণবিস্মরণের রোগ কবি মাত্রেরই বোধহয় থাকে। মাশুক তো এমন কি প্রপার নাউনও মাঝে মধ্যে ভুলে যায়। এখন এই বেদিশা অবস্থায় মাশুকের সামান্য সংসারে যে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত তার মুখখানি দেখার জন্য মাশুক তার পড়ার টেবিল থেকে উঠতে যাবে এমন সময় চায়ের কাপ নিয়ে বধূটি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সোজা মাশুকের টেবিলে এসে বলল, ' নে কাপটা ধর।'

মাশুক মুখ তুলেই ভয়ে ও আনন্দে এরকম চিৎকার করে উঠল, 'আম্মা তুমি? কখন এলে? আর তোমার বেশবাস এমন নতুন বৌয়ের মতো কেন?'

মাশুক স্বপ্নের নিজস্ব যুক্তি বা বাস্তবতার মধ্যে সহসাই প্রবেশ করায় তার যুবতীবেশী মাকে তার খুব ভাল লাগল। তার ইচ্ছে হল মাকে কদমবুসী করতে।

কিন্তু মায়ের বয়স এতো কম যে এক ধরনের দ্বিধা ও অস্বস্তির মধ্যে মাশুকের তার মাকে কদমবুসী করা হল না। মাশুক শুধু হাত ধরে মাকে তার বিছানার ওপর বসিয়ে দিতে গেলে মা বলল, 'দাঁড়া আগে বিছানাটা ঠিক করে দিই। তুই আগের মতো আগোছালোই আছিস।'

মা পরিপাটি করে বিছানা চাদর ঝেড়ে বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে বইপত্রের দিকে এগোতে গেলে মাশুক তার হাত ধরে ফেলল, 'এগুলো এখন থাক না আম্মা। কতোদিন পরে তুমি আমার বাসায় এলে। একটু বস না আমার পাশে। আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে কতোকাল ধরে ব্যাকুল হয়ে আছি। কেমন ভয় আর বিপদের মধ্যে আমার সময় কাটছে তুমি যদি জানতে আম্মা।'

'আমি সব জানি। কোনো ভয় নেই।'

'আমার বিপদের কথা তুমি সব জান?'

'কেন জানব না? আমি তোর মা নই? মায়েরা সব জানে।'

'আশ্চর্য, আমি ভাবতাম দিশা ছাড়া আমার ভয়ের কথা কেউ জানে না আম্মা। আর যারা দুর্ঘটনার খবরটা জানে তারা আমার বাইরের অবস্থাটাই জানে। আমি ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পাই আম্মা। কেন এতো ভয় পাই কিছুই জানি না। অথচ দেখো দিশা আমার জন্য এতোকিছু করেও এখন বলছে আসলে আমি তার কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি। সে আমার কেউ নয়?'

মাশুক স্বপ্নের ভেতর একেবারে ছেলে মানুষ হয়ে গেল। তার একবারো মনে হল না সে শিশুর মতো অনুযোগ করছে।

'জামদানী পরা বৌয়ের মতো ঘোমটা দেওয়া তার আম্মা হাসলেন,' 'আসলে দিশা কি তোর কেউ?'

'কেন কেউ নয়? দিশা না থাকলে কে আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতো? কে আমাকে বাসায় এনে এমন সেবাযত্ন করে সারিয়ে তুলতো? তুমি বল?'

'তবুও দিশা তোর কেউ হয়ে ওঠেনি। কারণ দিশা একজন অপরিচিত যুবতী মেয়ে। যেকিনা নিজের জন্য এখনো কাউকে স্থির করে নিতে পারেনি। এমনো তো হতে পারে দিশা তোকে সাহায্য করেছে তুই বিপদগ্রস্ত বলে। এখন বিপদ কেটে গেছে তুই নিজের ঘরে চলে এসেছিল। এখন আবার দিশার কি দরকার?'

'আমি যে দিশাকে ভালোবাসি আম্মা? তাছাড়া আততায়ীর ছুরি আমাকে আঘাত করার আগে আমি নিঃসঙ্গ আর নির্ভীক ছিলাম। আমি আহত হলে দিশা ছিল এতোদিন আমার সঙ্গী। এখন আমি একা থাকতে ভয় পাই।'

'আমি থাকব তোর সঙ্গে।'

'কিন্তু।'

'কিন্তু কি, আমি তোর মা জন্মদাত্রী...।'

ঘুমটা ছুটে গেল মাশুকের। সে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল। দারুণ পিপাসায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে। মাশুক সোরাই থেকে বাসি পানিই গ্লাসে ঢেলে ঢক ঢক করে পান করল। একবার মনে হল বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ইস্কাটনের বড়ো রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ পায়চারী করে আসে। কিন্তু বালিশের পাশে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই সে আবার চাদর টেনে শুয়ে পড়ল। ঘড়িতে এখন তিনটা বাজে। এবার সহজে মাশুকের চোখে ঘুম নামল না। সে এপাশ ওপাশ করে ঘুমোতে চেষ্টা করতে লাগল। সাধারণত মাশুক ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে না। বন্ধুরা বলে ঘুম গাঢ় হলে নাকি মানুষ স্বপ্ন দেখে না। আজ কতোকাল পরে মাশুক তার আম্মাকে স্বপ্ন দেখল। আর দেখল কিনা বধূবেশে? আম্মা তার যৌবনকালে কি এমন সুন্দরী ছিলেন? মাশুকের মনে হল তার স্বপ্নের মা দিশার চেয়েও লাবণ্যময়ী ছিলেন। কেন যে আজ রাতের স্বপ্নে আম্মা এসে হাজির হলেন তা মাশুক ভেবে পেল না। স্বপ্নে দেখা মার মুখখানি মাশুক বারবার স্মরণ করে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কল্পনার ঘূর্ণিপাকে মায়ের চেহারাটা কেবল দিশার চেহারায় পরিবর্তিত হয়ে পুনরাবর্তনে আবার মায়ের চেহারায় ফিরে আসতে লাগল। মাশুক শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছায় ঘুমের সিঁড়ি থেকে স্বপ্নের সিঁড়িতে পা বাড়াল।

মাশুক দেখল যে তার ঘরের দুয়ারটা একটু একটু করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। মাশুক প্রথমে ভেবেছিল পাশের ফ্ল্যাটের কাজের বুয়াটা বুঝি সাহায্যের জন্য এসেছে। তার একটা মেয়ে নাকি স্কুলে পড়ে। প্রতি মাসেই একবার সে মাশুকের কাছে সাহায্যের জন্য আসে। মাশুক কিছু টাকা তাকে প্রতিমাসেই সাহায্য করে। কৃতজ্ঞতায় বুড়িটা নিজে থেকেই মাসে একবার মাশুকের ঘরবাড়ি, বাসনকোশন এবং জানালার পর্দাগুলো ধুয়ে সাফ করে দিয়ে যায়। মাশুক রান্নার জন্য এতোদিন কোনো কাজের মানুষ রাখেনি। মূলত সে নিজেই রেঁধে খায়। যেদিন ব্যস্ততার জন্য পারে না সেদিন হোটেলে।

দুয়ারটা ফাঁক করে অতি সন্তর্পণে যে ভিতরে ঢুকল তার মুখ দেখা না গেলেও মাশুক তার পোশাক দেখেই আঁতকে উঠলো। এই তো সেই, যে তাকে অয়্যারলেসের পাড়ায় অন্ধকার গলিতে ছুরি মেরে পালাতে চেয়েছিলো? মাশুক স্বপ্নের ভেতরই বিছানায় উঠে বসল। আত্মরক্ষার জন্য এই মুহূর্তে তার একটা হাতিয়ার দরকার। কিন্তু বিছানা হাতড়ে মাশুক কিছুই না পেয়ে বালিশের পাশে ডায়েরীর ভেতরে রাখা তার ক্রশ কলমটাই তুলে নিল। সোনার হালকা প্রেলেপ দেয়া স্টীল বডির এই কলমটা ছাড়া মাশুকের ঘরে অন্য কোনো ধারাল অস্ত্র আছে বলে মাশুকের মনে পড়ল না। মাশুক কলমের শার্প অংশটা বাগিয়ে ধরে হাতটা পেছনে লুকিয়ে রেখে চিৎকার করে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

'আমি যেই হই এখন আমার হাতে কোনো ছুরি বা অস্ত্র নেই। সেদিনের ঘটনাটার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছি। আমাকে দেখে এখন তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

আগের মতোই চেঁচিয়ে কথা বলছে মাশুক।

আগন্তুক তার দুই হাত সামনে এনে খুলে ধরল, 'এই দ্যাখো। তুমি তোমার হাতের অস্ত্রটা, জানি না সেটা কি, রেখে দাও। এতো রাতে তোমার সাথে ধস্তাধস্তি এখন শোযাবে না। তার চেয়ে বরং অনুমতি দাও তোমার চেয়ারটায় একটু বসি। আমি ভাবতেই পারিনি একটি মাত্র ছুরির ঘা খেয়েই তুমি লেখালেখি ছেড়ে দেবে। আমরা প্রকৃতপক্ষে তোমার লেখালেখির বিরুদ্ধে নই। কেবল কবিতা লেখাটা তোমাকে ছাড়তে হবে। কারণ আমরা চাই না তুমি এই ভয়াবহ ক্ষুধার রাজ্যে মানুষের মধ্যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বদলে স্বপ্ন তৈরি করো। স্বপ্ন মূলত আমাদের আদর্শের শত্রু। তুমিও তো এককালে মার্কসবাদী ছিলে, সবই জান। তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ এতেই আমরা খুশি। এখন তোমার সাথে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলতে পারে।'

কথা বলতে বলতে লোকটা টেবিলের কাছে চলে এসেছে দেখে মাশুক তার

হাতে ধরা কলমটা আরো দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে থাকল।

'তোমাকে কে বলেছে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি?'

আমরা জানি তুমি আর লিখবে না। আমরা তোমার কল্পনার রাজ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার পর তুমি যে একটা লাইনও লেখার চেষ্টা করনি এতে আমরা সন্তুষ্ট। স্বপ্ন সৃষ্টিকারী কবিতা একটা অতিশয় বাজে জিনিস মাশুকুর রহমান চৌধুরী। বিপ্লবের বিরুদ্ধে এটা জঘন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমরা তোমাকে এর থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম মাত্র।

'তুমি আমাকে সেদিন খুন করতে চেয়েছিলে।'

'একেবারেই মেরে ফেলতে চাইনি।'

'তোমার সাথে কথা বলতে আমার কোনো প্রবৃত্তি নেই। তুমি খুনী, তোমাকে আমি পুলিশে দেব।'

'কিন্তু আমি কে তা না জেনে আমাকে কিভাবে পুলিশে দেবে? আমাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে দেয়া তোমার সাধ্যের বাইরে। গায়ের জোরে তুমি আমার সাথে পারবে না। সারাজীবন তো শুধু কাব্যচর্চাই করলে। স্বাস্থ্য বা শরীরচর্চা করনি। ওসব ছেড়ে দাও, এখন এসো অন্য কথা বলি।'

লোকটি এমন ধৃষ্টতার সাথে কথা বলছে মাশুক এর স্পর্ধায় অবাক হয়ে গেল।

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে কেন?'

'বলেছি ত কবিতা লেখ বলে। তুমি কবিতা লিখে একটা দরিদ্র দেশে, যে দেশের ছাত্র যুবক অধ্যাপক এবং সকল গোত্রের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পারস্পরিক প্রতিহিংসার আগুনে জনগণকে ধাবিত করতে দিনরাত পরিশ্রম করছে। সেখানে তুমি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কিংবা নারীদের দৈহিক লাবণ্যের গুণগান গাইতে পারো না। তুমি কেন যুবকদের প্রার্থনা করতে বলবে? যেখানে ধর্মের উচ্ছেদই বুদ্ধিজীবীদের কাম্য? তুমি তো খুব আল্লায় বিশ্বাস কর। কিন্তু একটা মাত্র ছুরির ঘা-ই তোমার সব স্বপ্নের এবং প্রার্থনার উৎসকে শুকিয়ে দিয়েছে। তোমার সাথে প্রকৃতপক্ষে এ মুহূর্তে আমাদের অর্থাৎ প্রগতিবাদী মানুষদের কোনো বৈরীতা নেই। বরং আমি তোমার জন্য একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। প্রস্তাবটা হলো যদি লিখতেই চাও তবে তোমার বস্তুপচা রহস্যবাদ এবং আধ্যাত্মিক অর্থহীনতাকে ছেড়ে আমাদের বিষয়-আশয় নিয়ে পদ্য রচনা কর। তোমার চেয়ে বড়ো কবিরাও অমুকের শার্ট, স্বাধীনতা তুমি ইত্যাদি কতো মহৎ কবিতা

লিখেছে। তুমি কেন কেবল উপোষী দেশে স্বপ্ন ফিরি করে বেড়াবে? যেখানে সব নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে সেখানে নদী নদী বলে চিৎকার করতে লজ্জা করে না তোমার? মিথ্যেবাদী কোথাকার?

মাশুক আর সহ্য করতে পারল না।

'হারামজাদা'–

বলে হাতে ধরা ক্রশ কলমের ধারাল মুখটা সজোরে বসিয়ে দিল আগন্তুকের বুকে

ঘুম ভেঙে গেলে মাশুক দেখল দুঃস্বপ্নের ঘোরে সে খাটের নিচে পড়ে কাতরাচ্ছে।

পরের দিন সকালে নিজেকে যথাসম্ভব পরিপাটি করে মাশুক অফিসে গেল। অন্যান্য সহ-সম্পাদকদের সাথে যৌথ একটি টেবিলে মাশুক লেখার কাজ করে। নিজের আসনে বসা মাত্রই অন্যান্য সহকর্মীরা তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করার আগেই পিয়ন এসে বলল, 'স্যার আপনাকে এডিটর সাহেব ডেকেছেন।'

মাশুক কলমটা পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল।

পাশের সহকর্মী বলল, 'যান এ ক'দিন না থাকার খেসারত একটা নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে। মনে হয় বেশ বড়োকিছু লেখার বিষয় চাপাবে।'

মাশুক সম্পাদকের কামরায় এসে ঢুকলে তিনি বেশ খোশমেজাজেই মাশুকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে আসুন কবি সাহেব, আপনার মতো লোককেও কেউ ছুরি মারতে পারে তা সহজে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। এখন কেমন আছেন?'

মাশুক বলল, 'ঘাটা শুকিয়েছে।'

'শুনলাম কে এক সুন্দরী মহিলা নাকি আপনাকে ওগুড অবস্থায় ইমার্জেন্সীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সেই মহিলার কাছেই আছেন?'

'আপনাকে এতোকথা কে জানিয়েছে জানি না তবে আমি আমার নিজের বাসাতেই আছি।'

'যেখানেই থাকুন আপনারা কবিরা হলেন গিয়ে ভাগ্যবান মানুষ। নইলে

ছিনতাইকারীর হাত থেকে ছিটকে গিয়ে কেউ সুন্দরী মহিলার হাতে পড়ে?'

'আপনি যার কথা বলছেন তিনি একজন শিক্ষিকা। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের টিচার। ঘটনার রাতে তিনি ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে মানবতার খাতিরে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। এর মধ্যে অন্যকিছু খুঁজতে যাওয়া বৃথা।'

'না না অন্যকিছু খুঁজব কেন? আপনি ব্যাচেলর মানুষ, প্রতিভাবান কবি এবং সাংবাদিক আপনার নিসঙ্গতা দূর হলে আমি বরং খুশিই হই। কথাটা অন্যভাবে নিয়েছেন দেখে আমি সত্যি দুঃখিত। আসুন কাজের কথা বলা যাক। ধরুন এই যে আমাদের এই রাজধানী শহরে ক্রমাগত ছিনতাই হচ্ছে। সহজে কেড়ে নিতে না পারলে দুষ্কৃতকারীরা মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। বেশির ভাগই মেয়েদের দৈহিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের কান হাত পা ছিঁড়ে গয়নাপত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। বেগতিক দেখলে হত্যার রিশ্‌কও নিচ্ছে। এটা যে আমাদের যুব সমাজের মানসিক বিকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ, আমি এর ওপর আপনার কাছে একটা বাস্তব ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ নিবন্ধ চাই। দেখুন না, আপনার মতো একজন কবিকেও রেহাই দেয়া হলো না। ছিনতাইকারী আপনার কাছ থেকে কি কি কেড়ে নিয়েছে বলুন তো?'

কথা বলতে বলতে সম্পাদক সাহেব মাশুককে একটা সিগ্রেট অফার করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। মাশুক প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে বলল, 'দেখুন, আমার ওপর আক্রমণটাকে ঠিক ছিনতাইকারী ঘটনা বলা যায় না। আমাকে যে আক্রমণ করেছিল সে একজন ছিনতাইকারী সন্দেহ নেই। তবে সে আমার কাছ থেকে ঘড়ি বা কলম কিংবা মানিব্যাগ দাবী করেনি। সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো আমি কবি বলে। তার ধারণা আমার কবিতা এ দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপন্থী। আমার কবিতায় স্বপ্ন ও রহস্যের কথা আছে এবং বাংলাদেশের মতো একটা ক্ষুধার্ত মানুষের দেশে আমি স্বপ্ন ফিরি করছি এটাই নাকি আমার অপরাধ। আমি বাংলাদেশের মানুষের উপবাসী উদরের কথা না বলে এদেশের সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনায় পঞ্চমুখ। আমাকে নাকি এ মুহূর্তে মেরে ফেলাই কর্তব্য।'

'বলেন কি সাহেব, এমন উদ্ভট কথা তো কখনো শুনিনি? কবিরা তো মূলত জাতির মর্মমূলে স্বপ্ন এবং আশাই প্রবিষ্ট করান। রবীন্দ্রনাথও কি তাই করেন নি?'

কৌতূহলী হয়ে বললেন সম্পাদক সাহেব।

'কিন্তু এসব যৌক্তিকতা নিঃস্বপ্ন, রাজনৈতিকভাবে কমিটেড কবি সাহিত্যিকগণ অতীতে কোনোদিনই মানেননি, এ সত্যও আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আদর্শগতভাবে যারা রবীন্দ্র সাহিত্য কিংবা সংগীতের ধারে কাছে নেই তারাই এখন রবীন্দ্র সংগীত এবং সাহিত্যের বড়ো উপাসক। কারণ রবীন্দ্রনাথ অতীত থেকে উঠে এসে তার সাহিত্য ও সৌন্দর্যের শত্রুদের চিনিয়ে দিতে কিংবা প্রতিকার করতে পারবেন না। এর ফলে তার সমস্ত স্বপ্নকে মানুষের মধ্যে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে তারই অস্ত্রে তার আদর্শের এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব নয়। আর এই মুহূর্তে যারা বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মন থেকে কল্পনার মধ্যে বেঁচে থাকাটুকু কেড়ে নিতে চায়, চায় রহস্যের উচ্ছেদ। তারাই প্রকৃত কবিদের আঘাত না করে পারে না। আমাকে যারা বা যে ব্যক্তি আক্রমণ করেছিল তারা চায় আমি আর কাব্যরচনা না করি। তারাও একটা জিনিস আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে বটে। সেটা হলো কবির সাহস।'

মাশুক এতোক্ষণ পরে তার জ্বলন্ত সিগ্রেটে একটা সুখটান দেবার সুযোগ পেল। সম্পাদক সাহেব মাশুকের কথায় কি একটা বিষয় পেয়েই তাকে চেপে ধরতে চাইলেন, 'বেশ তো আপনি আপনার মনের চিন্তার এদিকটা নিয়েই লিখুন। স্বপ্ন কল্পনা সৃষ্টি করে বলে কেউ কাউকে মেরে ফেলতে চায়, এটা তো খুব ভয়ানক কথা? যারা এদেশে গ্রামপন্থী প্রগতিশীল রাজনীতি করে কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলন করে তারা মানবজাতির সর্বপ্রকার স্বপ্ন বা কল্পনা শক্তির উচ্ছেদ কামনা করে এটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না কবি সাহেব। আপনার ওপর যা ঘটেছে তা যদি কোনো শিক্ষিত লোক ঘটিয়ে থাকে তবে আততায়ী ধরা পড়লে বোঝা যেতো তিনিও কোনো না কোনোভাবে কবিতার সাথে জড়িত। এটা প্রফেশনাল জেলাসি। আপনার খ্যাতিই সম্ভবত কারো ঈর্ষার কারণ হয়েছে। তবে এসব ব্যাপারে সাহস হারানো উচিত না। আপনি পূর্বাপর এই ঘটনাটা নিয়েই একটা আর্টিকেল লিখুন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, কবিরা খুব নিরীহ প্রাণী, উদাসীন, কেবল মেয়েদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারা যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যাও করতে পারে, এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। আপনি একটা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছেন। শারীরিক এবং মানসিকভাবে ঠিক ফিট করলে আরো দু'চারদিন বরং রেস্ট নিন। সম্ভব হলে বাসায় বসেও লিখতে পারেন।

আপনার ব্যাপারে তো আমি কোনোদিনই অফিসিয়েল নিয়ম খাটাই না।'

বেশ আন্তরিকতা নিয়ে হাসলেন সম্পাদক সাহেব। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন মাশুকের দেহমন এখনো কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে লেখার মতো সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

মাশুক বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার সত্যি আরো দু'চার দিন বিশ্রাম নেয়া একান্ত দরকার। যদি সম্ভব হয় আমি ঘরে বসেই লিখব। উঠি।'

মাশুক সেকশনে এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে ঢুকতেই সহকর্মীদের একজন বলল, 'আপনার একটা ফোন এসেছিলো। নাম নিশানা। আপনি এডিটরের রুমে ছিলেন। বলল সম্ভব হলে রিং ব্যাক করতে। ফোন নম্বর দিয়েছেন। লাগিয়ে দেব?'

মাশুক বলল, 'থাক, কষ্ট করতে হবে না। নাম্বারটা আমাকে দাও, আমিই করছি।'

ভদ্রলোক আস্ত টেলিফোন সেটটাই উঁচু করে তুলে মাশুকের হাতে দিল। মাশুকের প্রতি রয়েছে তার সহকর্মীদের এক ধরনের গভীর শ্রদ্ধাবোধ। শুধু সুকবি বা সুলেখক হিসেবেই সহকর্মীদের মধ্যে এ শ্রদ্ধাটুকু যে এদেশে সহজে জন্মায় না তা বলাই বাহুল্য। মাশুক এটা আদায় করে নিয়েছে তার কাজ, সহৃদয় ব্যবহার এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তার দ্বারা। সবাই জানে এ সেকশনে মাশুকের চেয়ে ওয়াকিবহাল কলাম লেখক আর একজনও নেই। দিনরাত যে এই কবি মানুষটি বিশ্বের সমসাময়িক সব ঘটনা জানার আগ্রহে পড়াশোনা করে একথা সবারই কমবেশি জানা। কোনো একটি সংবাদ সূত্রের ব্যাখ্যার জন্য তরুণ সাংবাদিকগণ সব সময়েই মাশুকের শরণাপন্ন হয়। এমন কি অন্য পত্রিকা থেকেও সমানে টেলিফোন আসতে থাকে।

এক সময় মাশুক এদেশের একটা বড়ো দৈনিকেই কাজ করত। কিন্তু লেখালেখি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে বনেনি বলে একটা পাক্ষিকে এসে ঢুকেছে।

নিশার দেয়া নাম্বারে ডায়াল করতেই নিশার গলা পাওয়া গেল। মাশুক বলল, 'কি ব্যাপার মিসেস আকরাম? আমার খোঁজ করেছিলেন?'

'কে কবি ভাই? হাঁ আমি আপনাকে খুঁজছিলাম, আপাকে গতরাতে কে যেন টেলিফোনে ধমকিয়েছে। কিসব বলেছে, তা আপা আমাদের কাছে ভাঙতে চায় না। শুধু বলে ছি ছি ছি কি লজ্জা! আজ কলেজেও যায়নি। আমি আসার সময় ছুটির দরখাস্ত কলেজে রেখে এসেছি। আমারও কেমন যেন লাগছে' আমার এমন

সাদাসিধে বোন কেমন মনমরা হয়ে ঘরে বসে আছে। আপনার অফিস থেকে আমাদের বাসায় একটা ফোন করুন না। করবেন?'

'আপনার বোন কি আমাকে টেলিফোন করতে বলেছে নিশা?'

'তা অবশ্য বলেনি। তবে আমার ধারণা আপনার কল পেয়ে আপা কথা বলে একটু হালকা বোধ করবে।'

'তাই নাকি? আপনার এ ধারণা হঠাৎ হলো কেন?'

'হঠাৎ হবে কেন? সারা সময়টাতো আমার বোনকে জানছি। আর কৈশোরকাল থেকে জানি আমার বোন আপনার কবিতার ভক্ত। আপনি কি সে পরিচয়টুকু আমাদের সাথে একদিন কাটিয়েও পাননি?'

তীর্যকভাবে প্রশ্ন করল নিশা। টেলিফোনে কোনো চক্ষুলজ্জা থাকে না। কিংবা এ সবের ধার ধারতে হয় না এটা নিশানার মতো বুদ্ধিমতীর তো জানাই আছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মাশুক বলল, 'আপনাদের বাসার টেলিফোন নাম্বারটা যেন কতো?'

'বারে আসার সময় আপনার ডায়রীতে লিখে দিলাম, ভুলে গেছেন?'

'এ মুহূর্তে ডায়রীটা আমার সাথে নেই তো। আর তাছাড়া আমার বাসায় ফোন না থাকায় সচরাচর কাউকে টেলিফোন করে গালগল্প করা আমার হয় না। কারো নাম্বারও আমার মুখস্ত থাকে না। আচ্ছা, নাম্বারটা একটু বলুন প্লিজ?

নিশা নাম্বার বললে দ্রুত হাতে মাশুক নাম্বার লিখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা রাখুন, দেখি আপনার বোনের সাথে কথা বলা যায় কি না।'

নিশা ফোন রেখে দিলে রিসিভারটা হাতে নিয়ে মাশুক দ্বিধাকম্পিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এহ'টা নাম্বারে ডায়ালটা ঘুরিয়ে গেলেই এমন একজনের কানের কাছে ঘন্টা বেজে উঠবে যে মাশুকের গলা শুনতে আগ্রহী হলেও তার আওয়াজটাকে মনে করে তার সততা এবং সাধ্বীতার জন্য অস্বস্তিকর। মাশুক নাম্বার লেখা স্লিপটা কি মনে করে টেবিলে চাপা দিয়ে রিসিভার রেখে দিল। নিজের সীটে বসে অতিশয় ধীরে সুস্থে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বন্ধু ও সহকর্মীদের দিকে ফিরে বলল, 'আমার শরীরটা এখানো ঠিকমতো সেরে ওঠেনি। আমি আরো কয়েকটা দিন ছুটি নিয়েছি। আমার জন্য আপনাদের ওপর যে বেশি লেখার চাপ যাচ্ছে তা আমি চারদিন পরে এসে পুষিয়ে দেব। আজ আসি, খোদা হাফেজ।'

মাশুক রাস্তায় বেরিয়ে এসে রিকশাকে ইস্কাটনের দিকে চলতে বলে ভাবতে লাগল দিশাকে টেলিফোন না করাটা বোধহয় উচিত হলো না। নিশা রাতে ফিরে যখন বোনকে জানাবে কবি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তার তো তোমাকে ফোন করার কথা? তখন দিশা কি ভাববে, ভাববে কি যে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তাকে টেলিফোন করিনি? কিন্তু দিশাকে কে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে? মাশুকের আততায়ী কিংবা সেইসব লোকেরা কি যারা স্বপ্নের মধ্যেও মাশুককে দিয়ে 'স্বাধীনতা তুমি' জাতীয় কবিতা লিখিয়ে নিতে প্রস্তাব দ্যায়?'

মাশুকের কি মনে হল অয়্যারলেস রেলগেটের একটু আগে এসে রিকশাটা পৌঁছামাত্র সেঞ্চুরী আর্কিডের সামনের রাস্তায় ওপাশে যাওয়ার ফাঁকটা দেখিয়ে সে বলল, 'এদিকে যাও, আমি সামনের মোড়েই নেমে যাব।'

অয়্যারলেস রেল গেটের মোড়ে এসে মাশুক রিকশা থেকে নামল। কি যেন একটা ভাবনা মাশুককে দিশাদের বাসার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে মাশুক সেই গলিটার মাঝামাঝি আসতেই একবার থমকে দাঁড়াল। এখানেই সে ছুরিকাহত হয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। যেন একটু ভয় হল মনে। মনে হল সেদিন যদি হত্যাকারী সফল হতো তবে তো তার এ পৃথিবীর আলোবাতাসে ঘুরে বেড়াবার আর কোনো ফুরসৎই থাকত না। আল্লার অসীম করুণা যে তার বুকে আত্মরক্ষার মতো সাহস এবং শরীরে নিজেকে বাঁচাবার মতো যথেষ্ট বল ছিলো। স্বপ্নে যদিও সে আততায়ীর সাথে আলাপ করে জেনেছে আক্রমণকারীর তাকে একেবারে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিলো না। কিন্তু এ কথা কি করে বিশ্বাসযোগ্য বলে সে মনে করবে? ধস্তাধস্তিটা তো হয়েছে তারই সাথে। কেবল সেই জানে আক্রমণকারী তাকে বাগে আনবার জন্য প্রচণ্ডভাবে শক্তি প্রয়োগ করেও পরাজিত হয়ে এবং তার হাত ফসকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্বপ্নের আততায়ী মূলত মাশুকেরই কল্পনা মাত্র।

দ্বিধাকম্পিত পায়ে মাশুক এসে দিশাদের বারান্দায় দাঁড়াল। ভেতরে মানুষের চলাফেরা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এ বাড়িতে থাকার সময় মাশুক যেমন যখন-তখন দিশার ঘরে এসে ঢুকে পড়ত আজ তেমনভাবে বিনা অনুমতিতে দিশার কামরায় ঢোকার সাহস হলো না মাশুকের। সে কলিং বেল বাজাতে দরজার পাশে হাত তুলতে যাবে এমন সময় কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, 'থাক ওটা আর বাজাতে হবে না। যান ভেতরে। আমি রান্নাঘরের গ্যাস নিভিয়ে আসছি। এতোক্ষণ রান্না ঘরেই ছিলাম। চা খাবেন তো?'

মাশুক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দিশা। দেখলেই বোঝা যায় গেরস্থালির কাজকর্মে ব্যস্ত। মাশুকের জবাবের অপেক্ষা না করেই দিশা কিচেনের দিকে চলে গেলো। মাশুক কতোক্ষণ চুপচাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঢুকল। সামনেই দিশার পড়ার টেবিল বেশ সুন্দর করে গোছানো। দিশা একটা শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে পড়াশোনা করে। চেয়ারে একটা পাতলা হাতে তৈরি গদি। মাশুক চেয়ারে নিঃশব্দে বসল। এ সময় পাশের ঘর থেকে টেলিফোন বাজলে মাশুক উৎকর্ণ

হলো। একটু বিরতি দিয়ে আবার টেলিফোনটা বেজে যাচ্ছে। পাশের ঘরটা নিশা ও আকরামের। সে ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরবে কিনা মাশুক তা বুঝতে পারছে না। এ সময় ও ঘর থেকে দিশার গলা পাওয়া গেল।

'হ্যালো? হাঁ দিশারী বলছি।'

একটুক্ষণ দিশার গলা আর শুনতে পেল না মাশুক। সম্ভবত টেলিফোনের অপর প্রান্তে যে আছে সে দিশাকে কিছু বলছে। আর দিশা চুপ করে কতোক্ষণ শুনে হঠাৎ ফেটে পড়ল।

'আমি কি করব না করব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি বা আপনারা যেই হোন জেনে রাখুন আমি কবির কবিতার ভক্ত। আপনারা কাউকে আপনাদের ইচ্ছেমতো কিছু লেখাতে পারেন না। কি বললেন আমাকেও আক্রমণ করবেন। জানি এ শহরে অনেক গুণ্ডা বদমায়েশ ছিনতাইকারী আছে কিন্তু সবচেয়ে অমানুষ হলো মানুষের স্বপ্ন ছিনতাইকারীরা। না চ্যালেঞ্জ হবে কেন? আপনারা দেশের একজন গুণী মানুষকে নার্ভাস ব্রেক ডাউন করাতে চাইছেন। আমি শুধু তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লিখতে অনুপ্রেরণা দিতে চাই।'

এখানে এসে দিশা কিছুক্ষণ আবার কি যেন চুপ করে শুনল তারপর হঠাৎ হাসল।

'আমাকে যে সব কুৎসিত ভাষায় গাল দিচ্ছেন এর প্রতিটি শব্দই বলে দিচ্ছে আপনারা কতো অসহায় এবং ভীতু। তুই তুকারি করছেন কেন? কই আমি তো আপনাকে অভদ্র কোনো কথা বলিনি? কি বললেন? গাল দিলে কি বলতাম? এতোক্ষণে আপনি আমাকে অসুবিধেয় ফেললেন। আমি সত্যি আপনাকে কোনো মন্দভাষায় কিছু বলতেই পারতাম না। আমি কিভাবে গালি দিতে হয় তা জানিই না। এটুকুই শুধু আপনাকে জানিয়ে দিতে পারতাম এবং এখনো পারি যে, আমি আপনার মতো মানুষদের ভয় পাই না। আর কবি মাশুক সাহেবের মত মানুষ যাতে কোনো ঘাতকের ভয়ে তার স্বাধীন ইচ্ছেকে বিপথগামী না করেন আমি সে চেষ্টা ছাড়ব না। আর কিছু বলার নেই আমার, রিসিভার রাখছি।'

কিছুক্ষণ পর দু'টি কাপ এনে মাশুকের সামনে একটা রেখে দিশা তার বিছানায় বসতে বসতে বলল, 'চায়ের বদলে কফিই করে দিলাম। আপনি তো আবার কফিই পছন্দ করেন বেশি।'

মাশুক বলল, 'এখন অবশ্য চা-ই চেয়েছিলাম। থাক এ সময় কফিটা বরং ভালোই লাগবে।'

দুজনই এক সাথে চুমুক দিল যার যার পেয়ালায়।

'আজ থেকে বুঝি অফিস যাওয়া শুরু হলো?'

'গিয়েছিলাম তবে অফিস করার মতো মুড নেই। প্রকৃতপক্ষে মনের বল খানিকটা ফিরে এলেও শরীরটা দুর্বল। শুনলাম আপনি আজ কলেজ যাননি। কে নাকি টেলিফোনে ধমকাচ্ছে আপনাকে? নিশা টেলিফোন করেছিলো।'

'হাঁ ধমাকচ্ছে বটে। তবে কারো ধমকে কলেজ যাইনি এটা ঠিক নয়। যাইনি আপনার মতো মুড নেই বলে। পড়াতেও মুড লাগে। হঠাৎ এলেন বোধহয় ধমকানোতে যাতে ভীত না হই এ কথা বলতে?'

কফির কাপটা বিছানায় পড়ে থাকা একটা বইয়ের মলাটের ওপর রাখল দিশা।

'আমি অবশ্য এর চেয়েও জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছি দিশা। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে কথাটা পাড়তে পারি।'

'বলুন।'

'আমি একা থাকতে আর পারছি না দিশারী।'

'এর মানে হলো আপনার মন থেকে আতংকের ছায়াটা এখনো একেবারে কেটে যায়নি কবি সাহেব।'

'না আমি ভয়ের কথা বলছি না।'

মাশুকের কথায় বেশ একটু অবাক হল দিশা। আরো কিছু শোনার জন্যে হেসে বলল, 'আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য তাহলে পাহারাদার দরকার। আমি তো এতোদিন খবরদারী করলাম। জানেন তো খবরদারী আর পাহারাদারী এক কথা নয়?'

মাশুক এর কোনো জবাব না দিয়ে কতোক্ষণ মাথা নুইয়ে চুপচাপ বসে থাকল। তারপর কি মনে হতে দিশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনাকে যারা টেলিফোনে ভয় দেখাচ্ছে তারা আপনাকে কি বলতে চায়? নিশ্চয় তারা আপনাকে আমার ব্যাপারে যাতা বলেছে। আমি শুধু তাদের বক্তব্যটা শুনতে চাই।'

'শুনে কি লাভ হবে? তার চেয়ে বরং বলুন এর মধ্যে কি লিখলেন?'

'কিছুই লিখতে পারছি না দিশারী।'

এমন অসহায়ের মতো দিশার পূর্ণ নামটা উচ্চারণ করল মাশুক দিশার কেমন

যেন মায়া হলো।

'তা হলে তো কবিতার শত্রুরাই জয়ী হচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে।'

'আমি তো বলেছি আমি আর একা থাকতে পারছি না। একাকী আমি আর বোধহয় কবিতা লিখতেও পারব না। আমার একজন কেউ দরকার। এমন একজন যে কিনা কল্পিত কিংবা শুধু অক্ষর দিয়ে, উপমা আর প্রতিতুলনা দিয়ে তৈরি নয়। বরং অন্য অজ্ঞাত কারণে আলৌকিকভাবে নির্মিত। যার ওপর নির্ভর করা অর্থাৎ যাকে নিয়ে স্বপ্ন রচনা করা যায়। অথচ নিজে যে হবে রক্তমাংসের মানুষ।'

আবেগে মাশুকের গলাটা কাঁপছে। যেন বাতাসে পাতার মতো তার ঠোঁট দু'টি থরথর করে উঠেছে। উত্তেজনায় আর হালকা ঘামে মাশুকের চিবুকটা পর্যন্ত চিকচিক করে উঠল। দিশা টেবিলের ওপর রাখা মাশুকেরই সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট তুলে এনে মাশুকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন এ সময় একটা সিগ্রেট খেলে বোধ হয় ভাল লাগবে।'

'আমি ঠিক গুছিয়ে মনের কথাগুলো বলতে পারছি না দিশা। কি যেন বলতে চাই ঠিক সাহসও পাচ্ছি না। অথচ আমার মন বলছে আরো সাহসী হয়ে আমাকে আপনার কাছে এসব প্রস্তাব তুলতে হবে।'

মাশুক দিশার হাত থেকে সিগ্রেটটা নিয়ে জ্বালাল।

'আমার তো মনে হয় যথেষ্ট সাহসী মানুষ আপনি। প্রস্তাবটার যৌক্তিকতা নিয়ে যখন আপনার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে তখন না হয় আমাকে কিছু এই মুহূর্তে নাই বললেন। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। কোথায় পালাব বলুন? আজও টেলিফোনে আমাকে আবার ভয় দেখান হয়েছে। পালাবার যাদের পথ থাকে না তাদের কি প্রতিরোধ না করে উপায় আছে?'

'আচ্ছা, আপনাকে টেলিফোনে কি ধরনের কথা বলা হচ্ছে তাকি আমি জানতে পারি না?'

'আপনাকে এসব আমি বলতে পারব না। শুধু এটুকু জানাতে পারি আমাকে উদ্দেশ করে খুব ইতর মন্তব্য করা হচ্ছে। এতে আমার ধারণা হয়েছে টেলিফোনকারী অতিশয় কাপুরুষ। সে আপনার মতো মানুষের সাথে কথা বলারই যোগ্য নয়। এ নিয়ে অযথা চিন্তা না করে আপনি আবার লেখার চেষ্টা করুন। আমার দৃঢ় ধারণা এ অস্ত্রেই কেবল আপনার শত্রুরা ঘায়েল হবে। এ দেশের জন্য স্বপ্ন চাই। এতো হতাশার মধ্যে মানুষ বাস্তব নিয়ে বাঁচতে পারে না। পারে কেবল কল্পনা, আশা আর অলীক স্বপ্নের মধ্যে বাঁচতে। সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা

পড়ে পড়ে এবং এ কয়দিন আপনার সাথে মিশে আমার এই ধারণা হয়েছে। আমি এখন বুঝতে পারি আপনার শত্রু কারা এবং কেন তারা একজন কবিকে নিবৃত্ত করতে চায়। যারা এতোদিন মানুষের রাজনৈতিক প্রগতির কথা বলে বিশ্বের প্রতিভাবান কবি–তারুণ্যকে বিপ্লবমুখী করে রেখেছিলো তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় এখন তারা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের শেষ সম্বল যে কল্পনায় ডানা মেলে বেঁচে থাকা, সেটুকুও কেড়ে নিতে চায়। অন্তত বিপথগামী করতে চায় স্বপ্ন ও শিল্পের উদ্‌গাতাদের। আপনি এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আপনাকে একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে বৈকি কবি সাহেব। যদিও আমি আপনার কেউ নই, একজন সামান্য কলেজ শিক্ষয়িত্রী মাত্র। দৈবভাবে আপনার সাথে সম্পর্কিত। তবুও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয়ের কিছু আছে বলে ভাবি না। আপনি লেখার চেষ্টা ছাড়বেন না।'

থেমে থেমে একটানা আবেগাকুল কথা বলতে পারে দিশা। মাশুক মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিশার কথাগুলো শুনে বলল, 'আমি তাহলে আজ আসি।'

তারপর আর পেছন দিকে না ফিরে সোজা দিশার ঘর ছেড়ে সিঁড়িতে নেমে এলো।

যদিও এ কয়দিনে মাশুকের একটি পংক্তিও খাতায় জমল না। কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের পিছু ধাওয়া মাশুককে ছাড়ল না। ঐ রাতেই মাশুক এক অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল। উঠেই মনে হলো এই মুহূর্তে তার এক কাপ চায়ের তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নিজেই কিচেনে গিয়ে কেতলি চাপিয়ে টেবিলে ফিরে এল।

একটু আগে ভোরের আলো ফুটেছে। ঢাকা শহরের ভোর বেলাটা মাশুকের কাছে খুব ভালো লাগে। চারদিকে দোয়েলের শিসের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢাকা শহরের জেগে ওঠাটা আগের মতো প্রাচীন বলে মনে হয় মাশুকের। প্রতিবেশীদের কলে পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ। একটা দু'টো বাইসাইকেল রাস্তায় নেমে যাওয়ার আভাস কানে ভেসে আসছে। ভেসে আসে নাস্তার দোকানগুলো থেকে মাংস, মশলা আর ডালপুরীর গন্ধ। একটু পড়েই অফিসগামী মানুষের ভীড়ে পথঘাট সয়লাভ হয়ে যাবে। ভীতিকর দ্রুততায় ছুটতে শুরু করবে বাস আর ট্রাক। মাশুক নিজেই এক কাপ চায়ের পানি চাপানোর ইচ্ছেয় উঠে দাঁড়াতে গেলে কলিংবেল ও দরজার কড়াটা এক সাথে নড়ে উঠল। এমন সাত সকালে কে এল? ভাবতে ভাবতে ভেতর থেকে আটকান ছিটকিনিটা খুলে দরজা একটু ফাঁক করতেই দেখল দিশা দাঁড়িয়ে। মাশুক কি বলবে ঠিক করতে পারছে না দেখে দিশা

নিজেই বলল, 'ভেতরে আসব?'

মাশুক নিঃশব্দে দুয়ার মেলে সরে দাঁড়াল।

'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'এতো সকালে আমার বাসায় আসাটা অবাক হওয়ার চেয়েও একটু বেশি বলেই ভাবছি।'

'রাতে এক ফোটা ঘুম হয়নি। আজানের সময় উঠে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে গোসল করে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামাযের বিছানায় বসেই মনে হল, যে কথাটা আপনি বলতে পারছেন না বলে গতকাল আপনাকে আরো সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিদেয় করলাম সে সাহসটা আমারও আছে কি না। আমারও নেই। প্রত্যাখ্যান বা প্রস্তাব উত্থাপনে কেবল পুরুষের ওপর দায়ভাগ চাপিয়ে বসে থাকলে অনেক সময় মানুষের সম্পর্কের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত এমনো তো হতে পারে আপনি পারলেন না। আপনার লজ্জার চেয়ে আপনার সাহস আর অধিক উঁচুতে উঠতে পারল না। সে ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষ যদি কেবল তিনি নারী বলে তার প্রেম বা প্রত্যাখ্যানের কথা উচ্চারণ না করেন তবে সেটা অন্যায় এবং আমার বিচারে অপরাধ। অনেক ভেবে-চিন্তে আমি স্থির করেছি আমিই আপনাকে কিছু বলব।'

'আমাকে প্রত্যাখ্যানের আগে অন্তত এক কাপ চায়ে কোনো আপত্তি হবে না তো দিশারী?'

'শুধু চায়ে পোষাবে না। সকালে কিছু না মুখে দিয়েই চলে এসেছি। আর কিছু হবে না?'

'দু'টো ডিম পোচ করে দিতে পারি।'

'ও কাজটা বরং আমি করে আনছি, একটু জিনিসপত্রের তাকগুলো দেখিয়ে দিন।'

মাশুক কিচেনে দিশাকে সব দেখিয়ে দিয়ে এসে বিছানায় বসে আতংকিত হয়ে থাকল। আতংকিত এ জন্য নয় যে দিশা তাকে প্রত্যাখান করতে এসেছে। যদিও সে বলেছে প্রত্যাখ্যানের আগে এক কাপ চা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিশার এখানে এতো সকালে আগমনটা যে কোনোরূপ বিরাগ বা প্রত্যাখ্যানের লক্ষণ নয় তা মাশুকের মতো ভাবুক মানুষের বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয়নি। হয়নি যে, নিশ্চয়ই দিশার মতো বুদ্ধিমতী মহিলাও বুঝতে পেরেছে।

একটু পরেই ডিমের পোচ আর চা নিয়ে দিশা এসে মাশুকের বিছানায় বসল,

'চা আর পোচটা খেয়ে নিন, চলুন বাইরে গিয়ে কোথাও বড়ো একটা নাস্তা খাব।'

'আজও কলেজ কামাই বুঝি?'

'তা কেন, কলেজে যাব ন'টায়। দশটা থেকে একটা ক্লাস আছে।'

দিশা পিরিচ মুখের কাছে এনে চামচে তুলে বেশ কায়দা করে ডিমের পোচটা খেয়ে নিয়ে এক গ্লাস পানি খেল। তারপর বেশ আরামের সাথে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'গত রাতে আমি ঘুমোইনি কবি সাহেব। শুধু আপনার কথা চিন্তা করে সারারাত জেগেছি। গায়ে পড়ে আপনার সেবা করতে না গেলে হয়তা আপনার অসহায়তা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। এতে আমারও খানিকটা বাড়াবাড়ি আছে। আপনি ছুরিকাহত হয়েছিলেন এ কথা জানলে আপনার পুরুষ ভক্তদের কেউ কেউ হয়তো আপনার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। কিন্তু আমার মনে হয় এ সুযোগে আপনার মতো কবির সাথে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার কামনা নিশ্চয়ই ছিল। এখন আপনার অসহায়তা, প্রতিভা, গুণ এবং সর্বোপরি লাজুকতায় আমি মুগ্ধ। যতোটুকু বুঝতে পেরেছি আমাকেও আপনার অপছন্দ নয়। অথচ কথাটা বলার জন্য আমার কাছে গিয়েও আপনি বলতে পারেননি। হয়তো আরো কয়েকদিন পর আপনি আরো সাহসী হয়ে কথাটা বলতেন। কিন্তু ততোদিন অপেক্ষা করলে যারা টেলিফোনে ভয় দেখায় তারা আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করার মওকা পেয়ে যতো।'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল দিশা।

মাশুক দিশার আবেগকে উসকে দিয়ে আরো কিছু পাওয়া যায় কি না তা পরীক্ষা করার জন্যে হাসল, 'আমি গতকাল আপনার কাছে গিয়েও যে কথাটা বলতে পারিনি বলে আপনার ধারণা সে কথাটা সম্বন্ধে আপনি কি খুবই নিশ্চিত দিশারী?'

দিশা চমকে উঠে মাশুকের দিকে তাকাল।

'মোটামুটি।'

'আপনার মোটামুটি আন্দাজটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতে বলি? রাগ করবেন না, গতকাল আপনি আমাকে আরো একটু সাহস সঞ্চয় করে আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন।

'হ্যাঁ বলেছিলাম, কারণ আপনি বারবার পুরুষের মুখে সবচেয়ে বেমানান যে কথা। যে কথা সাধারণত ভিখিরিদের মুখেই মানায় ভালো-। বলছিলেন আপনি আর একা থাকতে পারছেন না। একবারও কথাটার আমার কাছে কি অর্থ হতে পারে তা ভেবে দেখেননি। একা থাকতে পারছেন না, মানে আপনার চির

নিঃসঙ্গতা দূর করতে একজন সঙ্গী চাই। তেমন পাটনার চাইলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেননি কেন? পাশ্চাত্যে তো দিচ্ছে। আমার কাছে, একজন কুমারী মেয়ের কাছে কথাটি পাড়া যে কতোটা লজ্জাহীন এতোবড়ো কবি হয়েও আপনি সেটা অনুভব করতে পারছিলেন না বলেই আমি আপনাকে আরো সাহসী হয়ে আমার দুয়ারে যেতে বলেছিলাম। তবে পরে চিন্তা করে দেখেছি এ সাহস তো আমারও থাকা উচিত। আমি সেই সাহসের বলেই সাত সকালে উঠে এখানে চলে এসেছি।'

লিশার কথায় তার চোখে মুখে বেশ উত্তেজনার ছায়া পড়ল। অস্বীকার করে লাভ নেই লিশার শারীরিক সৌন্দর্যে বেশ বৈচিত্র আছে। এর মধ্যে লিশার ডান চোখের আধ ইঞ্চি নিচে একটা পুঁতির মতো প্রবাল রংয়ের তিলে উত্তেজনার রক্ত সঞ্চারিত হওয়ায় তাকে বেশ রাগান্বিতই মনে হচ্ছে।

'সাহসী হয়ে সেদিন যদি আমি কথাটা বলতামই তাহলে কি বলতাম বলে তোমার ধারণা?'

তুমি বলার অনুমতি না নিয়েই এবং নিজেরই অজ্ঞাতে মাতক আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলো। নেমে এলো খানিকটা হিপ্‌নোটাইজড হয়ে। লিশা বেশ জোরেই হেসে ফেলল।

সাহসী হয়ে বললে বলতে, 'তোমার সেবায় সহানুভূতিতে, তোমার কাব্য এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তারও উর্ধ্বে যে নারীত্বের মহিমা তা আমি আমার ওপর ঘাতকদের ঝাঁপিয়ে পড়ার পর মুহূর্ত থেকে তিলে তিলে অনুভব করেছি। তাছাড়া আমার চোখে তুমি সুন্দর এবং বিদুষী। আমি তোমাকে ভালোবাসি। অনুগ্রহ করে আমার এই প্রেমকে পাত্তা দাও। হাঁ হাঁটু ভেঙে বসে এই বলতে।'

'আমি বলতে পারিনি বলে কি তুমি নিজেই আজ একথা আমাকে বলে অনুপ্রাণিত করতে এলে?

'না তো কক্ষনো না। আমার বলাটা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।'

লিশার বিপরীতধর্মী কথাটা শুনেই মাতকের কানুস চুপসে গেল। বিপরীতধর্মী কেন? লিশা কি তবে এখন মাতকের আবেগ উসকানোর খেলায় ঢুকে গিয়ে তার এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত শোনাতে যাচ্ছে? সে তাড়াতাড়ি বলল, 'তার চেয়ে বরং একটু আগে তুমি যেভাবে বললে, ঠিক সেইভাবে হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে আমি যদি বলার অনুমতি চাই তবে কি আমাকে

বলার অনুমতি দিতে পার না পিশারী।'

'পারি। তবে শেখানো বুলির চেয়ে আমার নিজের এ্যাপ্রোচটাই তোমার রোগ সারাবার জন্য বেশি উপাদেয় হবে না কি?'

দিশাও উত্তেজনায় বসে আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসায় খুব একটা ক্ষীণ আশায় জ্যোতি যেন মাস্তকের চোখের তারায় আলো ছড়িয়ে নিতে গেল।

'কবি আমি একজন কুমারী মেয়ে। আমার দেহে ও মনে ইতিপূর্বে অর্থাৎ তোমার সাথে পরিচয়ের আগে কারও কোনো, অন্তত কোনো পুরুষের স্পর্শ লাগেনি। সেদিন দুর্ঘটনার কারণে আমি তোমার সংস্পর্শে আসি। আমার উচিত ছিলো তোমাকে হাসপাতালে রেখে আমার রক্ত বাঁচিয়ে ঘরে ফিরে আসা। এতে তোমার অসুবিধে হলেও সেটা হতো সাময়িক। তুমি ঠিকই সেরে উঠতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে। কিন্তু আমার কাব্যপ্রীতি এবং তোমার ওপর আঘাতকারীদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য আমার মনে একজন মুসলিম নারীর স্বাভাবিক আত্মরক্ষার সীমা আরো একটু বাড়ানো যায় বলে ধারণা দেয়। প্রকৃতপক্ষে তোমাকে সাহায্য করাটা আমার কাছে মোটেই দোষণীয় কিংবা ধর্মীয় বিধি নিষেধের খেলাপ বলে মনে হয়নি। যদিও আমি কলেজে যাওয়া-আসার সময় খোলামেলাই চলাফেরা করি কিন্তু মুসলিম নারীর লজ্জাশরম সম্বন্ধে অবচেতন নই। আত্মরক্ষার জন্য খুব একটা কড়াকড়ির মধ্যে ঢুকতে না পারলেও আত্মরক্ষা করেই চলতে চাই। কবি এখন আমি বিপর্যস্ত। রাতে ঘুমোতে পারছি না কারণ সবসময় মনে হচ্ছে একজন কেউ, যে ক্ষিপ্র সক্ষম এবং সুন্দর পুরুষ, অবিশ্রান্ত দৃষ্টিতে, মুহূর্তের জন্য পলক না ফেলে আমার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে তছনছ করে দিয়ে তাকিয়ে আছে। সে আমার মন, দয়ামায়া ও স্নেহমমতার সবটুকু গ্রহণ করে একটা আত্মীয়তার আবহাওয়া তৈরি করে নিচ্ছে যা একজন মুসলিম যুবতীর জন্য বৈধ নয়। অথচ সে আমাকে যে ভালোবাসে কিংবা সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চায় তেমন কথা বলারও সাহস পাচ্ছে না। তেমন অবস্থায় আমার মতো একজন মুসলিম নারী, যার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সার্টিফিকেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া। তার নিজের মানসিক বিপর্যয় কিংবা প্রেম বুকের নিচে চেপে বসে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তোমার প্রতি আমার মানসিক উন্মত্ততা সৃষ্টির দায় উভয়ের। এখন এ ব্যাপারে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপনে তোমার সাহসহীনতা বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল। কিন্তু তুমি কিছু না বললে যেহেতু আমার মানসিক বিপর্যয়ের উপশম হবে না। সে কারণে আমিই তোমার কাছে আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছি।'

'প্রস্তাব না বলে নির্দেশ বললে একটু খারাপ শোনায় না দিশা?'

চমকে গিয়ে প্রশ্ন করল মাশুক।

' সেটা যে শুনছে তার সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। একজন অবিবাহিত যুবতী হিসেবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত। আর পটভূমিকায় ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক রয়েছ তুমি। ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তোমার প্রতি আমার মন ভালোবাসায় জর্জরিত। আমি নির্দোষ এবং পরিস্থিতির শিকার। এখন আমি আর তোমার কাছে প্রেমের প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি না। কারণ প্রেম আমার মানসিক সতীত্বের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে হেরে গেছে। ফলে তুমি আমাকে ভালোবাস একথা বলতে গিয়েও বলতে পারনি। কিন্তু আমি হার মানতে পারি না। কারণ তাহলে অচেনার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে ফেলার পাপের দায়ভাগ আমার ওপরই বর্তাবে। তার চেয়ে আমি আদেশ দিচ্ছি, আমাকে বিয়ে কর।'

বেশ অকম্পিত গলায় কথা শেষ করল দিশা। তার সারা চেহারায় একটা পবিত্র আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

মাশুক অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মাথা তুলে দিশার দিকে এক পলক চেয়েই যেন বিদ্যুৎ বিনিময়ের মতো চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'চল কোথাও গিয়ে বড়ো করে নাস্তা খেয়ে নিই।'

'এটা আমার কথার জবাব নয় কবি।'

'তুমি তো জবাব চাওনি। নির্দেশ দিয়েছ। এখন আমাকে হুকুম মান্য করার জন্য অন্তত তিন চারদিন সময় তো দেবে? নাকি সেটাও এই আহত হৃদয়ের প্রাপ্য নয় দিশারী?'

পুরো ঘোমটায় মুখটা ঢেকে দিশারী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল আমার একটা ভালো রেষ্টুরেন্ট জানা আছে। আজ সেখানে খেয়ে সোজা কলেজে যাবো।'

মাত্র এক দশক আগেও বাংলাদেশের আধুনিক কথাসাহিত্যে কেবল প্রেমের গল্প ফাঁদার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা মধ্যবিত্ত পরিবারের বালখিল্য পাঠকদের দারুণভাবে উত্তেজিত করলেও চিরন্তন সাহিত্যের স্বাদ দিতে পারেনি। তেমন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চিন্তাশীল রসজ্ঞ পাঠকগণ এতোদিন যে ধরনের সৃজনশীল লেখকের অপেক্ষায় ছিলেন আল মাহমুদ তাদেরই একজন। তার সাম্প্রতিক গল্প ও উপন্যাসগুলোই এর প্রমাণ। আল মাহমুদ বলেন, একবিংশ শতাব্দীটা হবে মহৎ কবিদের গদ্য লেখার শতাব্দী। আমরা তার সাম্প্রতিক রচনা প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চাইছি, সত্যি এটা কবিদেরই গদ্য লেখার যুগ বটে।

'কবি ও কোলাহল' আল মাহমুদের সমকালীন সমাজদৃষ্টির এক অভিনব মননশীল মানবিক কাহিনী যা প্রেমের ভিত্তির ওপর রচিত না হয়েও বলতে চেয়েছে, প্রেম ছাড়া জীবন চলে না। প্রেমের সামনে জগৎ কাঙাল।

প্রকাশক